শুক্রে শনি

শুক্রে শনি

দিব্যেন্দু পালিত

প্রমা

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ । কলকাতা-৭০০ ০১৭

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রকাশক : সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ,
কলকাতা-৭০০ ০১৭

মুদ্রক :
কণক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী,
৪/৫৬এ, বিজয়গড়, কলকাতা-৩২

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

প্রফুল্ল রায়কে

শুক্রে শনি

নিজের ছকের বাইরে কোনোদিনও এক পা হাঁটেনি দিবাকর। ছকটা সে চেনে। জল, ঝড়, সাময়িক অশান্তি যাই আসুক, সেখানে যাওয়া, ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো নির্দেশ নেই।

কোনোদিনও হাঁটেনি বললে অবশ্য ভুল হবে। বত্রিশ বছর বয়সে যে-ছকটা তার কাছে আগাগোড়া বাঁধানো মনে হয়, ষোল বছর বয়সেও সেটার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু তার কাছে নয়। ঠিক সেই বয়সেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ছকটা সোজাসুজি উঠে এলো তার চোখের সামনে।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অনায়াসে ফেল করে বসল দিবাকর। ইংরিজীতে ফেল, ভূগোলে ফেল, এমন কি অঙ্কও—যেটায় মাথা পাকা বলে কোনোদিন মাথা ঘামাত না সে—ডুবিয়ে গেল তাকে। দিবাকরের জীবনে সেটাই প্রথম শক্। তাদের পরিবারের পক্ষেও প্রথম শোক। দুটো মিলে এমনই মুহ্যমান করে দিল তাকে যে ঘরের দরজা বন্ধ করে একা চুপচাপ মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে লাগল দিবাকর। রেজাল্ট বেরুনোর দিন পাঁচেকের মধ্যেই তার ফরসা, নাদুসনুদুস চেহারাটি বদলে গেল বেমালুম, কালি পড়ল চোখের কোলে, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল যার-পর-নাই অসহায়তা।

দিবাকরের বাবা প্রভাকর ব্যবসাদার হলেও শান্ত স্বভাবের নিরীহ মানুষ। সারা জীবনের পরিশ্রমে কেটারিংয়ের কারবারে যশ ও পসার দুই-ই জমিয়েছে ভালো। স্ত্রীর নামে নাম—অনুরাধা কেটারিং বললেই এক নামে চেনে লোকে। নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি, ব্যাঙ্কে টাকা-কড়িও কিছু কম নেই। প্রথম সন্তান মেয়েটির অল্প বয়সে ভালো ঘরে ভালো বরে বিয়ে দেবার পর একমাত্র পুত্রটিকে দাঁড় করানোই ছিল তার

ধ্যানজ্ঞান। ফেল করে বাপকেও কুঁজো করে দিল দিবাকর। হতাশা ছাড়াও, ছেলের হাবভাব দেখে অদ্ভুত একটা ভয়ও ঢুকে গেল প্রভাকরের মনে। স্যুইসাইড করবে না তো!

এরই কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে এক অদ্ভুত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। প্রভাকরই নিয়ে এলো। ছোটখাটো অমায়িক চেহারার ভদ্রলোক, মাথা জুড়ে টাক, সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে মুখে। নাম অরবিন্দবাবু। বোঝা গেল প্রভাকরের সঙ্গে পুরনো খাতিরের সম্পর্ক। ভদ্রলোককে যথাবিহিত আদর যত্ন, আপ্যায়ন করে বসিয়ে দিনী গলায় প্রভাকর বলল, 'ওর ছকটা তাহলে দেখাই?'

'ছক তো দেখবই। তার আগে ছেলেকে দেখি—!' বললেন অরবিন্দবাবু, 'মেয়ের বিয়েতে এলাহি খাইয়েছিলেন মনে আছে। ছেলে কোথায়?'

'শুনছ!' আড়ালে-থাকা স্ত্রীকে শুনিয়ে প্রভাকর বলল, 'খোকাকে ডেকে দাও তো—'

দিবাকর এলো। উদাসীন মুখচোখ। কিছুদূর এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মুখ নিচু করে।

'বাঃ! চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে শুক্রের জাতক।' এক পলক দেখেই অরবিন্দবাবু বললেন, 'নাম কি?'

'দিবাকর।'

'রবির প্রভাবও বর্তমান।'

হাত ধরে ছেলেকে কাছে টেনে এনে প্রভাকর বলল, 'কাকাবাবুকে প্রণাম কর। নামী লোক। ভাগ্য বলে দেন।'

'বোসো ভাই, বোসো।' ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ছেলেটির হাতের ছোঁয়া থেকে নিজের পা দুটি আলাদা করে ডিভানের ওপর বাবু হয়ে বসতে বসতে প্রভাকরের দিকে হাত বাড়ালেন অরবিন্দবাবু।

'দিন দেখি ছকটা এবার।'

দৃশ্যটা পরিষ্কার মনে আছে দিবাকরের। হলদে রঙের ছুলোট

কাগজের ওপর লাল কালিতে ঘরকাটা বস্তুটির ওপব ঝুঁকে পড়েছেন অরবিন্দকাকা। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'বছর চারেক আগে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল ? আঘাত টাঘাত ?'

দিবাকর তখন হাঁ করে গিলছে কথাগুলো। স্মরণ করার চেষ্টায় প্রভাকর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে বলেছিল সে, 'বল খেলতে গিয়ে হাত ভেঙেছিল—দিদির বিয়ের আগে—'

'ভেঙেছিল তো! ভাঙতেই হবে।' হাসিটা পুরোপুরি ছড়িয়ে গেল অরবিন্দকাকার মুখে। রেকাবি থেকে এক খিলি পান তুলে গালে পুরতে পুরতে প্রভাকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কন্যা লগ্ন। শনির প্রবেশ—ঠিকই আছে। শেষ ধাক্কাটা দিয়ে গেলেন—'

'কী বলছেন!'

'ছক ঠিকই আছে। সময় খারাপ ছিল। শোনো ভাই, সুসময় এসে যাচ্ছে। শুক্রের দশা পড়ছে, চলবে টানা কুড়ি বছর। মন দিয়ে পড়ো, সামনের বছর পাশ করবেই। কলেজেও যাবে। তারপর বাবার ব্যবসা—শুক্রের দশা, শুক্রের জাতক। শুধু ভোগ—। তবে, বিবাহ কিঞ্চিৎ দেরিতে। শুক্রের দশার অন্তিমে। বউয়ের রঙ চাপা, কিন্তু সুন্দর মুখশ্রী—। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, ব্যবসাই টানবে—'

নিজের ছকটাকে সেদিন থেকেই পুজো করে দিবাকর। পরের বছর ঠিক-ঠিক পাশ করে কলেজে ঢোকার পর বিশ্বাসটা বেড়ে যায় আরও। ঠিকানা খুঁজে, গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর রাজভোগ নিয়ে অরবিন্দ-কাকাকে প্রণাম করে আসে একদিন।

এরই বছর দুয়েক পরে আর একটি ঘটনায় বিশ্বাসটা পাকা হয় আরও। দিবাকর তখন কলেজে। কোথাও কিছু নেই, বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গেল প্রভাকর। জ্ঞান ফিরলো হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার বললেন, সেভেনটি-টু আওয়ারস্ না গেলে বলা যাবে না কিছু। ততোদিনে দিব্যি গাড়ি ড্রাইভ করতে শিখে গেছে দিবাকর, সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল অরবিন্দবাবুর কাছে।

সব শুনে ও চিন্তা করে অরবিন্দবাবু বললেন, 'মৃত্যুযোগ নেই। তবে ভোগাবে। মঙ্গল, শনি উভয়েই বক্রী। চিন্তা কি, ব্যবসাটা তুমিই ছাখো—'

দিবাকর জানে, ছক যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যেতে হবে। পরের দিন থেকেই ব্যবসা দেখতে শুরু করে দিল সে। কাজের চাপে টান পড়তে লাগল সময়ে। কিছুদিন অনিয়মিত হলো কলেজে, তারপর আস্তে আস্তে কলেজে যাওয়া বন্ধ করল। মনটা অল্প খুঁতখুঁত করলেও খারাপ লাগল না খুব। ক্রমশ টের পেতে লাগল বইয়ের চেয়ে টাকায় সুগন্ধ বেশী। আর আশ্চর্য, প্রভাকরের আমলে কখনো যা হয় নি, দিবাকর দেখাশুনা শুরু করতে না-করতেই রমরম করে বাড়তে লাগল অনুরাধা কেটারিং। একটা অর্ডার সামলাতে না সামলতেই এসে পড়ে আর একটার ধাক্কা। বালিগঞ্জ সামলে ছুটতে হয় সাহেবপাড়ায়। লক্ষ্মী আসেন পার্সোনাল সুপারভিসনে। যশ বাড়ে। টাকাও। ঢাকুরিয়ায় তিনতলা ভিতের বাড়ির একতলা শেষ করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল প্রভাকর। চার বছরের মধ্যেই চটপট আরও দুটি ফ্লোর তুলে ফেলে দিবাকর। রাশি-চক্র। বিভিন্ন গ্রহের ছবি দিয়ে তৈরি অনুরাধা কেটারার্সের চমৎকার ক্যালেণ্ডার ঝুলতে থাকে কাস্টমারদের ঘরের দেয়ালে কিংবা অফিসে। ব্যবসাটা ভালোই বোঝে দিবাকর। অর্ডার এমনিতেই আসে, তবু বড়ো অর্ডারের গন্ধ পেলেই হলো—যে-কোনো রাস্তা ধরে শুরু হয়ে গেল ছুটো-ছুটি। কনে বাড়ির কেটারিং পেলে নিউ মার্কেটের বাহারি ফুলের বোকে পাঠায় বরের বাড়ি। লেগে থাকে। জানে তো, সুযোগ সদ্ব্যবহারের জন্যেই।

এইভাবে সুখের ঢল নামে তার চারিদিকে। ছকে যে সারাক্ষণ চোখ বোলায় তা নয়। তবে একটা হিসেব রাখে মনে। শুক্রের দশা চলবে কুড়ি বছর। এরই মধ্যে পার হয়ে গেল তার চোদ্দটি। বাকী থাকে ছয় বছর। কম কি! নারী সঙ্গের জন্যে মাঝে মাঝে মন ও শরীরটা কুঁইকুঁই করলেও কষ্টটা চাপা দেয়। ভাবে, দশা থাকতে থাকতেই বিয়েটা

হুট করে লেগে যাবে একদিন—যে আসবে, রঙ চাপা হলেও তার মুখশ্রী সুন্দর। ভাবনাটা এলিমিনেশনের প্রসেস শিখিয়ে দেয় দিবাকরকে। যাতায়াতের রাস্তায় ফরসা মেয়ে দেখলে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না কোনোভাবে। ভাবে, লাভ কী!

একটা ঘটনা ঘটে যায় একদিন।

নিউ আলিপুরে স্টিল ফেবরিকো লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সেহানবিশের মেয়ের বিয়ের কেটারিংয়ের তদারকি করে বাড়ি ফিরছিল দিবাকর। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে, সেহানবিশের বড়ো ছেলে সুশান্ত ছুটে এলো হঠাৎ।

'কোনদিকে যাবে, দিবাকর?'

'বাড়ি ফিরব, স্যার। ঢাকুরিয়া—'

'ওহ্! তাহলে তো ভালোই হলো—।' পাতলা হতে শুরু করেছে নিমন্ত্রিতদের ভিড়। হই-হট্টগোল কমে যাবার পর সানাইয়ের সুরেলা আওয়াজ মিঠে লাগছে কানে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকটি যুবতীর দিকে তাকিয়ে সুশান্ত হাঁকলো, 'এই যে, কমলিকা, তুমি গোলপার্কে যাবে তো? উঠে পড়ো এই গাড়িতে—'

ততোক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে দিবাকর। অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে মেয়েটি এগিয়ে আসার সময় লক্ষ করল, মেয়েটির রঙ ময়লা, টান-টান স্বাস্থ্য। টিকালো নাক আর বড়ো বড়ো চোখে ফুটে উঠেছে কেমন একটা অহঙ্কারের ভাব। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁকা লেগে গেল বুকে। কেমন মিলে যাচ্ছে যেন!

গাড়ির কাছে এসে পড়েছে মেয়েটি। দিবাকর ভেবেছিল পিছনের সীটে বসাবে। কিন্তু—সত্যিই কি ছক টানছে তাকে? সে কিছু করবার আগেই সামনের দরজাটা খুলে ধরে সুশান্ত বলল, 'উঠে পড়ো। দিবাকর, এ কমলিকা, তনুর ক্লাসফ্রেণ্ড। রাত হয়েছে, ওকে একটু নামিয়ে দিও বাড়ির সামনে। মেনি থ্যাঙ্কস্।'

কী সুখ গাড়ি ছেড়ে দিল কথাগুলি ভাবতে। বেনারসী, প্রসাধন

সবকিছু মিলিয়ে বিয়ে বাড়ির গন্ধ কমলিকার শরীরে। গন্ধটা নাকে সইয়ে নিতে যতোক্ষণ সময় লাগে তার আগেই ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছে গেল ওরা। পিছন থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর। স্মার্ট হবার চেষ্টায় দিবাকর বলল, 'গোলপার্কের কোন জায়গায় যাবেন ?'

'রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে—'

'ঠিক জায়গাটা বলে দেবেন, নামিয়ে দেবো।'

কাঁধ তুলে ঠোঁটের ওপরটা ঘষে নিল দিবাকর। কপালে ও ঠোঁটের ওপর হালকা ঘাম জমতে শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে নারভাস হয়ে পড়েছে সে। ফাঁকা রাস্তা হলেও এমন স্পীডে গাড়ি চালাতে লাগল যাতে মনে হবে যাবার তাড়া নেই কোনো।

'আপনার অসুবিধে করলাম না তো !'

নিজে থেকেই যখন কথা বলেছে তখন নিশ্চয়ই স্মার্ট বলা যেতে পারে মেয়েটিকে। মাপা হেসে দিবাকর বলল, 'নট অ্যাট অল। আমি ঢাকুরিয়ায় যাবো—গোলপার্ক দিয়েই যেতে হতো—'

'আপনি কি তনুদের আত্মীয় ?'

'না। তবে অনেক দিনের আলাপ।' দিবাকর বলল, 'আমার নাম দিবাকর গুহ। আপনার বন্ধুর বিয়েতে কেটারিংয়ের ভার আমাদের ছিল।'

'অনুরাধা কেটারার্স ?'

দিবাকর হাসল। কনফিডেন্ট হাসি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে রীতিমতো হ্যাণ্ডসাম মনে হয় তার। মনে হয়, ছকের নির্দেশ না থাকলে সিনেমাতেও নামতে পারত।

'ও মা !' উচ্ছ্বাসের গলায় কমলিকা বলল, 'কী ভালো খাবার আপনাদের। মালাইকারিটা—সত্যি—ডেলিসাস !'

সত্যিই খেতে ভালোবাসে কমলিকা। দিবাকর ভাবল, যদি এই মেয়েটিই তার ভবিতব্য হয়, তাহলে এই একটি ব্যাপারে সরবরাহে কোনো ত্রুটি থাকবে না তার। রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে ছকের টানেই

এগোচ্ছে তারা। আসবার সময় গাড়ির সাস্‌পেনসারে একটা আওয়াজ হচ্ছিল, সেই শব্দটাও এখন আর নেই। অসুবিধে হলো, যতোই আস্তে গাড়ি চালাক, গোলপার্ক আর দার্জিলিংয়ের দূরত্ব এক নয়। পৌঁছে গেল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে কমলিকা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'গুড নাইট।' চমৎকার গলায় বলল দিবাকর। বাড়িটা ঠিক ঠিক চিনে নিয়ে ফেরার সময় দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে কমলিকা। এ ক্ষেত্রে, ভাবল, 'আবার দেখা হবে' কথাটা বলা বাড়াবাড়ি হতো।

সেদিন রাতে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুম এলো না দিবাকরের। এতোদিনের পরেও বিয়েবাড়ির গন্ধে যে নতুনত্ব আছে কোনো, এটা যেন আজই টের পাচ্ছে। মাথা জুড়ে একটিই দৃশ্য—নিজেই নায়ক, গাড়ি চলছে, পাশে কমলিকা, হাত নাড়ছে দরজায় দাঁড়িয়ে, ইত্যাদি। অবশেষে ঘুম যখন এলো তখন শুক্লপক্ষের চাঁদ নেমে এসেছে তার দোতলার ঘরের জানলায়; নিচের তলায় প্রভাকরের ঘরের দেয়ালঘড়িতে তিনটে বেজে গেল।

ঘুম ভেঙে উঠতে উঠতে প্রায় সাড়ে নটা। অন্যদিন বেলা আটটা বাজতে না বাজতেই কাজে বেরিয়ে পড়ে সে, সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌঁছে যায় ল্যান্সডাউন রোডে নিজের অফিসে। কতোদিন পরে আজ অভ্যস্ত রুটিনে ছেদ পড়ল মনে পড়ে না। তবু খারাপ লাগল না। এক আধদিনের অনিয়ম খারাপ কিছু নয়, এইভাবে যুক্তি সাজাতে গিয়ে আবার সে ঢুকে পড়ল গতরাতের দৃশ্যের মধ্যে। বড্ড বড়ো আর খটোমটো এই কমলিকা নামটা—ছোট করলেই কমলি হয়ে দাঁড়ায়। না, না—সেটা বিচ্ছিরি শোনায় কানে। তার চেয়ে ছক যখন এই নামটিই ছুঁড়ে দিয়েছে তার দিকে, মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কি!

একই ভাবনার জের টেনে সাড়ে দশটা নাগাদ ঢাকুরিয়া থেকে গাড়ি ছুটিয়ে আসছিল দিবাকর—প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত স্পীডে—যতোটা দেরি মেক-আপ করা যায়। কিন্তু, গোলপার্কের কাছাকাছি পৌঁছুতেই মন্থর হয়ে পড়ল। বাসস্টপে কে? কমলিকা না! পোশাক বদলালেও

মুখ কি আর বদলায়! হ্যাঁ, কমলিকাই। একটা বাস আড়াল করে দিয়েছিল—আড়ালটা সরে যেতেই গাড়িটা আস্তে আস্তে বাসস্টপের সামনে এনে দাঁড় করালো দিবাকর। মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কোনদিকে যাবেন?'

'আ-রে, আপনি!' কমলিকা এগিয়ে এলো, 'আমি ইউনিভার্সিটি যাবো।'

'তার মানে কলেজ স্ট্রীট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে দিবাকর বলল, 'শ্যামবাজার। আসুন, উঠে পড়ুন।'

এ নিশ্চয়ই ছকের খেলা। তা না হলে কমলিকা তার সঙ্গী হবার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়বে কেন! দিবাকর ভাবল, দেরি যখন হয়েইছে, আরও একটু হোক।

'আপনার জন্যে তবু একটা দিন বাসের উপদ্রব থেকে বাঁচা গেল!' কমলিকাই শুরু করল, 'যা ভিড় আর ঠেলাঠেলি!'

'আপনি রোজ এই সময়ে যান?'

'প্রায় এই সময়ে—'

অল্প মুষড়ে পড়ল দিবাকর। তার সময়ের সঙ্গে কমলিকার সময়ের ব্যবধান প্রায় দু ঘন্টা। এতোটা সময় মেক-আপ করবে কী করে! অবশ্য এখনই এই সমস্যার সমাধান করে দরকার নেই। তীক্ষ্ণ হর্ণ দিয়ে একটা মিনিবাস তাড়া করে আসছে পিছনে। সেটাকে পাশ দিয়ে দিবাকর বলল, 'কী সাবজেক্ট আপনার?'

'ইংলিশ লিটারেচার।'

'গুড!' কথাটা স্মার্টলি বললেও নিজের ভিতরে একটু গুটিয়ে গেল দিবাকর। এরপর কমলিকা যদি শেক্সপীয়ার না হ্যামলেট কী সব বলে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়, কী জবাব দেবে সে! বাবার অসুখ, ব্যবসা—এইসব অজুহাত দেখিয়ে একটি লেখাপড়া জানা মেয়ের কাছে

পার পাওয়া যাবে না। তবে। অস্বস্তি নিয়েই অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে গেল সে। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে কতোটা কনসেনট্রেসন দরকার হয় কমলিকা বুঝে নিক।

কমলিকা কিন্তু লেখাপড়ার লাইনেই গেল না।

'আপনাকে খুব খাটাখাটি করতে হয়, না?'

'তা হয়। অলমোস্ট ফোরটিন আওয়ারস্, ডেইলি—'

'ইস্!'

সহানুভূতিটা নকল নয়। তবে কিনা পুরোপুরি জমে ওঠার আগেই কলেজ স্ট্রীট এসে গেল। আজ আর থ্যাঙ্ক ইউ বলল না কমলিকা। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল একটু, সোজাসুজি তাকাল দিবাকরের মুখের দিকে।

'চলি। আবার দেখা হবে—'

পরের দিন সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ আবার গোলপার্কে ফিরে এলো দিবাকর এবং প্রায় মিনিট পনেরো ধরে বেশ কয়েকবার গোলপার্কটা চক্কর দেবার পর দেখল কমলিকা আসছে। আশেপাশে যারা ছিল তারা দেখল একটি যুবক গাড়ি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই একটি যুবতী ঝটপট উঠে পড়ল তাতে। এবং ইত্যাদি।

ব্যাপারটা জমে গেল। মাসখানেকের মধ্যেই পরস্পরের গভীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করল দিবাকর আর কমলিকা। এরই মধ্যে আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এসেছে তারা। কলেজ স্ট্রীটের রাস্তাটা দিন দুয়েক বেঁকে গেছে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে। চুমু খাবার একান্ত ইচ্ছা ম্যানেজ করতে হয়েছে হাফ-চুমু দিয়ে, তবে ছোঁয়াছুঁয়ি কম হয়নি। কমলিকা এখন কুমু। ছকের ব্যাপার—দিবাকর জানে, ছক যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যেতে হবে তাকে।

বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরে তার অফিসে ফোন করল কমলিকা।

'শোনো, এক্ষুনি একবার দেখা করতে পারবে?'

'কি হলো!'

'দেখা হলে বলব। আমি মেট্রোর সামনে দাঁড়াচ্ছি। তুমি চলে এসো।'

মাঘ মাস। বিয়ের মরশুম। রাশি রাশি অর্ডার আসছে, ম্যানেজ করা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। ব্যবসা ছেড়ে যখন তখন বেরিয়ে যাবার সময় নেই। খুঁতখুঁত করে মনটা। তবু উঠতেই হলো দিবাকরকে।

কমলিকার মুখ ব্যাজার। বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। ওকে গাড়িতে তুলে সোজা পার্ক স্ট্রীটে তাদের চেনা রেস্তোরাঁটির নিরিবিলিতে নিয়ে এলো দিবাকর।

'কী খাবে? চিংড়ি কাটলেট?'

'তুমি খাও। আমার মুড নেই।'

'কী হয়েছে!

কমলিকা জবাব দিল না। গালে হাত, মুখ নামানো। বোঝাই যায়, আজ সে ইউনিভারসিটি যায় নি; এমন কি মিনিমাম সাজগোজ-টুকুও করে নি। অগত্যা দুটো কফির অর্ডার দিল দিবাকর।

'কী হয়েছে বলবে তো!'

কমলিকা হঠাৎ বলল, 'তুমি কবে বিয়ে করতে পারবে আমাকে?'

'বিয়ে! এখনই! এম-এ পরীক্ষাটা দাও!'

'চুলোয় যাক পরীক্ষা। তুমি পারবে কি না বলো?'

'কী আশ্চর্য! হঠাৎ কী হলো বলবে তো!'

কমলিকা ঠোঁট কামড়ে ধরল। কফির কাপটা তুলতে যাচ্ছিল, খানিকটা কফি চল্‌কে পড়ায় কাপটা নামিয়ে রাখল আবার।

'বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে—'

'অ্যাঁ!'

'অনেকদিন ধরেই কথা চলছিল। তোমাকে বলিনি।' হঠাৎ দিবাকরের হাত চেপে ধরল কমলিকা, 'বিশ্বাস করো। আমি ভাবতেই পারিনি—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল দিবাকর।

তারপব জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে আমার এই ইয়েটা বাড়িতে জানে ?'

কমলিকা মাথা নাড়ল, 'জানলে খেয়ে ফেলবে।'

'পাত্রটি কে ?'

'ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছে বাড়ি। একান্ন বাই তিনের পাঁচ—বাপ ব্যারিস্টার মিটার।' কমলিকা দম নিল। তারপর বলল, 'লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে পাশ করা। ওখানেই পড়ায়। চার পাঁচ মাস আগে দেখে গিয়েছিল, তখন কিছু বলেনি। কাল ওর বাবা এসেছিল। ছেলে নাকি একমাসেব ছুটি নিয়ে আসছে—ফাল্গুনেই বিয়ে দিতে চায়। উঃ! অ্যাবসার্ড! আমি যে কি করব!'

কান্নার বেগ চাপা দিতে চোখে আঁচল চাপা দিল কমলিকা।

ঘটনাটা শুনেই চুপসে গিয়েছিল দিবাকর। কমলিকাকে কাঁদতে দেখে জোর পেয়ে গেল মনে। শুক্রের জাতক, শুক্রের দশা—হঠাৎ মনে হলো, তার ছকে ভুল নেই কোনো। লণ্ডনই হোক বা নিউইয়র্ক, উড়ে এসে তার হবু বউকে বিয়ে করব বললেই তো হয় না। সত্যিই অ্যাবসার্ড। এটা ছকের ব্যাপার। কিন্তু, আবার ভাবল, কমলিকার ছক কি বলে একটু দেখিয়ে নিলেই তো হয়।

'শোনো, আপসেট হবার কিছু নেই। তোমার ছক আছে ?'

'ছক !'

'হাঁ। কুষ্ঠি ?'

দিবাকরের কথা শুনে কেমন অন্যরকম হয়ে গেল কমলিকা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আছে– '

দিবাকর বলল, 'আমার ছকে আছে তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবে। এখন তোমার ছকটা দেখিয়ে নিলেই হয়—'

'তুমি অ্যাসট্রোলজি জানো না কি ?'

'না। অরবিন্দকাকা জানে। তাঁকে দেখাবো।'

ব্যস্ত গলায় কমলিকা বলল, 'মায়ের দেরাজে আছে। আমি আজই দেখাতে চাই—'

দিবাকর বলল, 'অতো ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। এনে দিও। কাল দেখালেও চলবে।'

'আর ইউ সিওর, তোমার ছকে আছে?'

'সিওর রে বাবা, সিওর—'

বিশ্বাস-অবিশ্বাস মেশানো একরকম চোখে দিবাকরের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির ভাবটা ফিরিয়ে আনল কমলিকা। আঁচলে মুখ মুছে বলল, 'আমার খিদে পাচ্ছে।'

পরের দিন সকালে অফিসে না গিয়ে দুটো ছক সঙ্গে করে অরবিন্দ-বাবুর বাড়িতে চলে গেল দিবাকর। রিটায়ার করলেও এখনো তেমনিই আছেন—অমায়িক, হাসিখুশি। সব শুনে বললেন, 'শুক্রের দশা কতোদিন হলো যেন?'

'প্রায় ষোল বছর।'

'মনে তো হয় হয়ে যাবে। মেয়েটির ছকটা কি এনেছো?'

কমলিকার ছকটি দেখানোর জন্যে অনেকক্ষণ ধরেই হাঁকুপাঁকু করছিল দিবাকর। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিল।

সরু রুপোর ফ্রেমের চশমাটা চোখে লাগিয়ে ছকটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন অরবিন্দবাবু। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন।

'করেছ কি হে! অ্যাঁ! জাতিকার লগ্নে বৃহস্পতি। বিদূষী মেয়ে। কিন্তু কস্মিনকালেও এর প্রেম করে বিবাহ হবে না।'

'কী বলছেন কাকাবাবু!'

'আমি কি বলব হে! ছকই বলছে। এ মেয়ের যার সঙ্গে বিবাহ হবে সে জাতিকার চেয়ে বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেক বড়ো হবে। ঐ, লণ্ডনের স্কুল না কি বললে?'

দিবাকর ডুবে যাচ্ছিল। বাঁচার শেষ চেষ্টা করে বলল, 'কিন্তু আমার ছক? কোনো উপায় দেখছেন না, কাকাবাবু?'

'মনে তো হয় না। তবু দেখি—'

কমলিকার ছকটি পাশে সরিয়ে দিবাকরের ছকটা হাতে তুলে নিলেন

অরবিন্দ।

'সর্বনাশ! শুক্রে শনি বসে আছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের আগে বিবাহের ধারেকাছে যেও না। এখন—এখন তোমার ব্যবসার সময় খুব ভালো। ধনলাভের সম্ভাবনা প্রবল—'

ছক দিবাকরকে সব দিয়েছে; ছকের বাইরে কোনোদিনও এক পা হাঁটেনি সে। যতোই ভালোবাসুক কমলিকাকে, যন্ত্রণায় ফালা ফালা হয়ে যাক বুক—যা সম্ভব নয় তা ঘটাবে কি করে! ফেরার পথে দুটো ছক আলাদা করে দু পকেটে রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে আঘাতটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করল দিবাকর। নিজের জন্যে কিছু নয়, সমস্যা কমলিকাকে নিয়ে। ঠিক দুটোর সময় ও অপেক্ষা করবে পার্ক স্ট্রীটের সেই রেস্তোরাঁর সামনে। হবে না বলা মানেই তো প্রত্যাখ্যান করা! কিন্তু উপায় নেই। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, ঝুলিয়ে রাখা যায় না।

দুটোর আগেই মন বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল দিবাকর। সকাল থেকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এরই মধ্যে অনেকটা জায়গা দখল করে ফেলেছে সে, ছকের ওপর আস্থাটা বেড়ে গেছে আরও। এখন ব্যবসার পক্ষে ভালো সময়। শুক্রে শনির ব্যাপারটা আগে জানতে পারলে কখনোই ঝুলত না কমলিকার সঙ্গে। তবু ভালো, আরও দূর গড়াবার আগেই ব্যাপারটা জানা গেল।

কমলিকা এলো কাঁটায় কাঁটায় দুটোয়। তাড়াতাড়ি হেঁটে আসার কারণে এবং উত্তেজনায় মুখের চাপা রঙে ফুটে উঠেছে বেগুনি আভা। হাঁপাচ্ছে অল্প। সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

'ভিতরে চলো, বলছি।'

ইচ্ছে করেই আজ পাশাপাশি না বসে প্রথমে কমলিকা কোথায় বসছে দেখে নিল দিবাকর এবং ঠিক তার উল্টোদিকে, মুখোমুখি বসল। গা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা কালকেই শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া, আর একটা কথাও ভাবছিল দিবাকর—সামনের দৃশ্যটি ভয়ংকর; বেচারা কমলিকা, উত্তেজনার মাথায় কামড়েটামড়ে দিলে ওকে দোষ দেওয়া যাবে না। বরং

আগে থেকেই নিরাপদ দূরত্ব খুঁজে নেয়া ভালো।

দুটো ফ্রেশ লাইম অর্ডার করল দিবাকর এবং খুব ঠাণ্ডা মাথায় পকেট থেকে কমলিকার ছকটা বের করে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'এটা ব্যাগে রাখো।'

'কী হলো বলবে তো!'

'বলছি। অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন! ওটা আগে ব্যাগে রাখো।'

ঈষৎ সন্দেহের চোখে দিবাকরের দিকে তাকাল কমলিকা। তারপর ছকটা ঝটপট ব্যাগে ভরে নিয়ে বলল, 'বলো!'

ইতিমধ্যে ফ্রেশ লাইম এসে গিয়েছিল। নিজের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে দিবাকর বলল, 'বলছি। আগে ওটা খেয়ে নাও। তুমি এখনো হাঁপাচ্ছ—'

আবার দিবাকরের দিকে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা শেষ করে টেবিলের ওপর রাখল কমলিকা।

'আর কি ফরমাশ আছে তোমার?'

'রাগ করছ!' দিবাকর নরম হলো এবার, 'কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না!'

'তার মানে!'

দিবাকর সাহস সঞ্চয় করল এবং নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'তোমার লগ্নে বৃহস্পতি। আমার সঙ্গে হবে না। মনে হচ্ছে ওই লোকটার সঙ্গেই—'

সমস্ত বেগুনি আভা হারিয়ে ফেলল কমলিকার মুখ। ক্রমাগত ছোট ও বড়ো হতে হতে স্থির হয়ে এলো টিকালো নাকটা। ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল অদ্ভুতভাবে। কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত চোখে দিবাকরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বদমাইশ! তাহলে এতোদিন ঘোরালে কেন!'

'আমি কোথায় ঘোরালাম, তুমিই তো ঘুরলে!' দিবাকর তৈরিই ছিল; জানে, কমলিকা আপসেট হবে, যা-তা বলবে। কিন্তু তাকে ঠিক থাকতে হবে। বলল, 'আমি কি করব! তোমার ছকে আছে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, খুব বিদ্বান লোকের সঙ্গে। আমি একটা গ্র্যাজুয়েটও নই।

তা ছাড়া—', শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল দিবাকর, 'আমার এখন শুক্রে শনি চলছে—'

'শুক্রে শনি চলছে!' চাপা গলায় ফুঁসে উঠল কমলিকা, 'ইল্‌লিটারেট্, লোফার কোথাকার! এখন কুষ্ঠি দেখাচ্ছ!'

'কুমু, শোনো—'

'চুপ করে থাকো।' পাশে রাখা ব্যাগটা হাতে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কমলিকা, 'লামপিশ্ পিগ! তোমার জন্যে আমার বিয়ে আটকাবে না—'

এমনই ঝট্‌কা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করল কমলিকা যে টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসটা উল্টেই পড়ছিল, তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল দিবাকর। এবং দেখল, আঁচল উড়িয়ে দ্রুত বেরুবার দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কমলিকা। তারপর সত্যি সত্যিই বেরিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল দিবাকরের। বেয়ারা এগিয়ে আসতে একটা কফির অর্ডার দিল সে এবং ব্যথাটা সহ্য করতে করতে ভাবল, কমলিকা তার সততার দাম দিল না। মাঝখান থেকে কতগুলো ইংরিজী গালাগাল দিয়ে গেল। লামপিশ্ না কি, কথাটার মানেও সে জানে না। পিগ মানে অবশ্য শুয়োর। যাক্ গে—এ-সবই হয়তো তার প্রাপ্য। ছকই দিচ্ছে। একটা পর্ব চুকে গেল। ছকের নির্দেশে শিগগিরই কমলিকার বিয়ে হয়ে যাবে ব্যারিস্টার মিটারের লণ্ডনে-থাকা ছেলের সঙ্গে। হয়তো বিয়ের পরেই চলে যাবে লণ্ডনে। গোলপার্কের কাছে বাস স্টপে আর ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আর তাকে—তাকে মন দিতে হবে ব্যবসায়। অরবিন্দকাকা বলেছিল—

এই সময় ধাঁ করে অন্য একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়ল দিবাকরের। বিয়ে মানেই তো খাওয়া দাওয়া, কেটারিং! ব্যবসা! কমলিকার বিয়ের অর্ডারটা নিশ্চয়ই সে পাবে না। কিন্তু, পাত্রপক্ষ তো কিছুই জানে না। ব্যারিস্টার বাপের বিলিতি ছেলে—নিশ্চয়ই এলাহি খরচ করবে। দারুন প্রসপেক্ট! ঠিকানাটা কি যেন বলেছিল কমলিকা? ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের

কাছে—হ্যাঁ, একার বাই তিনের পাঁচ কি?

না, এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। ঠিকানা খুঁজে কালই যেতে হবে। বেয়ারা কফি নিয়ে আসতেই দিবাকর বলল, 'ভাই, তোমাদের টেলিফোন ডিরেক্টরিটা নিয়ে এসো তো—'

সা বা ন

ফাল্গুন মাসের এক ছুটির দিনে রমাপতি হঠাৎ আবিষ্কার করল মেয়েটির প্রতি সে বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। গাড়োয়ালের মেয়ে, বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। নাম সুখী। চেহারার বর্ণনা দেবার দরকার নেই কোনো। এই বয়সের যে-কোনো যুবতীকে যে-কোনো স্বাভাবিক চোখের পুরুষ যে-যে মাংস, মাপ ও গড়নে দেখতে অভ্যস্ত তার কোনোটারই কম কিংবা বেশি নেই সুখীর শরীরে। তবে, যে-কাজের সূত্রে রমাপতি ওর সংস্পর্শে এসেছিল তাতে মন বা মগজের মাপ নেবার সুযোগ নেই কোনো।

ঘটনাটা আবিষ্কার করার পরই বেশ বিব্রত হয়ে পড়ল রমাপতি। নিজেকে বরাবরই সে স্বাভাবিক ও চরিত্রবান ভাবতে অভ্যস্ত। নিজের শিক্ষা, রুচি ও আচরণ সম্পর্কে এমনই সতর্ক যে সারাক্ষণ সেগুলি মুড়ে রাখে রাংতার মোড়কে। কচিৎ ধুলো পড়লে ঝেড়ে নেয় সাবধানে। দিল্লিতে বদলি হয়ে আসবার সময় মা-কালীর একটা ছবি সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল মা—হঠাৎ কখনো চোখের পাতা নাচলে কিংবা বুক টিপ-টিপ করলে চোখ বুলিয়ে নেয় ছবিটায়। জানে, ছোটখাটো অন্যায় এইভাবেই ক্ষমার যোগ্য হয়ে ওঠে। রমাপতিকে কনজারভেটিভ বলা যায়, কিন্তু হিপোক্রিট কখনোই নয়। মুখোশ এঁটে থাকার ব্যাপারটিকে সে ঘৃণা করে মনে-প্রাণে।

রমাপতির সঙ্গে একটু মেলামেশা করলেই এই গুণগুলি ধরা পড়ে। স্বভাবে ভেজাল নেই কোনো। মাথা নাড়লে নির্ভর করা যায়।

সত্যি বলতে, এইসব কারণেই তার দিল্লিতে আসার মাস খানেকের মধ্যেই একজন কর্মক্ষম, জাত-মানুষ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অফিসার যুবকের একা থাকার অসুবিধেগুলো উপলব্ধি করে ওর সঙ্গে সুখীকে জুতে দিয়ে-

ছিল অফিসে তার খাস পিওন আবিরলাল।

বদলির শর্ত হিসেবে তার আগেই অবশ্য সাউথ এক্সটেনসনের বাড়িটা পেয়ে গিয়েছিল রমাপতি। দু' ঘরের ছিমছাম বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। কথা ছিল একটু গোছগাছ করেই নিয়ে আসবে মাকে। তখনই জানা গেল বৌদি সাত মাসের পোয়াতি। শরীর ভালো নয়। নেগেটিভ ব্লাডের কারণে জন্মের সাত দিনের মধ্যেই মারা যায় আগের বাচ্চাটা। প্রায়ই ট্যুরে বেরুতে হয় দাদাকে। তখন ঠিক হলো, বৌদির ব্যাপারটা চুকে গেলেই মা আসবে।

রমাপতি ঘাবড়ালো না। কিছুদিন আগেই একটা ব্যক্তিগত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে নার্ভ শক্ত হয়ে গেছে তার। ওই ঘটনাটা না ঘটলে গত শ্রাবণে তারও বিয়ে হয়ে যেতে পারত। সবই ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, এমনকি কার্ড ছাপা পর্যন্ত। বিয়ের দিন পনেরো আগে শোনা গেল মেয়েটির নাকি আগেও বিয়ে হয়েছিল একবার, তারপর ডিভোর্স। কনে পক্ষ বেমালুম চেপে গিয়েছিল ব্যাপারটা। জানাজানি হতে ভেঙ্গে গেল। সেই সঙ্গে রমাপতির মনও। শরীর ও মন থেকে বিয়ে করার ইচ্ছেটাই চলে গেল একেবারে। ততোদিনে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার গায়ে, পরিচিতদের চোখে-মুখে। এরকম আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টের। কাজে সুনাম থাকায় দিল্লিতে বদলির চেষ্টাটা কার্যকর হতে দেরি হলো না।

জয়েন করার দিন কয়েকের মধ্যেই তার সুনজরে চলে এলো আবিরলাল। এমনও বলা যায়, রমাপতিই পড়ে গেল আবিরলালের সুনজরে। প্রৌঢ়, সজ্জন মানুষটি ; কাছাকাছি ডিফেন্স কলোনীতে থাকে। স্বেচ্ছায় ফাইফরমাস খাটতে লাগল রমাপতির। অফিসে লাঞ্চ পায় রমাপতি, রাতের খাবারটা সেরে নেয় কাছাকাছি রেস্তোরাঁয়। সকালের চা, ব্রেকফাস্টটা নিজেই করে নিত। বাকি থাকে ঘর ধোয়ামোছা, গেঞ্জি আণ্ডারওয়্যারটা কেচে দেওয়া, বিছানা তোলা ইত্যাদি। এইসব কাজের জন্যে একটা ঠিকে ঝি'র ব্যবস্থা আবিরলালই করে দিল। ঝটপট কাজ সেরে রমাপতি অফিসে বেরুনোর আগেই চলে যায় বুড়ীটা।

কাঁপরে পড়ল যখন দু'দিনের ছুটি নিয়ে মুলুকে যাবার নাম করে কেটে পড়ল বুড়ীটা। আবিরলালই খবর নিয়ে এলো ও আর ফিরবে না। সত্যিই ঝামেলা! দিন তিন-চার নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করল রমাপতি। তাতে ফল হলো উল্টো। চা তৈরি, ব্রেকফাস্ট বানানো ইত্যাদি যে কাজগুলো এতো দিন সে নিজেই করত, সেগুলি করার ব্যাপারেও আসতে লাগল আলসেমি। এটা করলে ওটা পড়ে থাকে; ঘরদোর নোংরা। পরপর দু'দিন একই আণ্ডারওয়্যার, গেঞ্জি পরে অফিসে গেল রমাপতি। একদিন নিজের ওপর অভিমান করে চা কিংবা ব্রেকফাস্ট কিছুই খেলো না—প্রচণ্ড মাথাধরা ছাড়াতে হলো অ্যানালজে-সিক গিলে। দিল্লিতে, বিশেষত এই অঞ্চলে, চট করে কাজের লোক পাওয়া মুস্কিল। কয়েক দিনেব মধ্যেই টের পেল রমাপতি, ভীষণ রকমের এক অসহায়তা মাথা চাড়া দিচ্ছে ভিতর থেকে এবং ভাবল, এর থেকে বাঁচার উপায় তাড়াতাড়ি লোক পাওয়া কিংবা তাড়াতাড়ি বৌদির ছেলে হওয়া কিংবা তাড়াতাড়ি মা'র চলে আসা ইত্যাদি। এগুলির কোনোটিই যেহেতু ফলপ্রদ সম্ভাবনা নয়, সুতরাং, সে মুষড়ে পড়ল। কাজকর্মে মন বসে না, অফিসে যায় দেরিতে, ল্যাঞ্চে বসে স্যুপে নুন ঢেলে ফেলে বেশি; বাড়ির চিঠিপত্র এলে আলগোছে চোখ বুলিয়ে ফেলে রাখে একপাশে। এমনকি ক্লান্ত ভাবনার মধ্যে মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, একবার বিয়ে ও ডিভোর্স হওয়া মেয়েটিকে বিয়ে করা এমন কি দোষের হতো!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এবারেও বাঁচিয়ে দিল আবিরলাল। 'কুচ বাত হ্যায়' বলে একদিন ছুটির পর ফলো করল তাকে—রমাপতি দোষ না ধরলে সে একটা প্রস্তাব করতে পারে।

রমাপতি এমনই অপ্রতিভ বোধ করছিল যে হ্যাঁ না কিছুই বলল না।

আবিরলাল বলল, 'দেখিয়ে সাব, আপ নারাজ না হো তো হামারা বেটি সুখী কালসে চলি আয়েগি—

এবারেও হ্যাঁ না কিছুই বলল না রমাপতি। সম্ভবত এরই মধ্যে

ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে সে। এখন আবিরলালই বলবে।

পনেরো বছর বয়সে দেয়াড়ুমের এক এক্কাওয়ালার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সুখীর। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই নানারকম অত্যাচার করত সুখীর ওপর। শ্বশুরবাড়ির লোকজন খারাপ! গালিগালাজ, মারধোর লেগেই ছিল। বার দু' তিন বাপের কাছে পালিয়ে এসেছিল সুখী, বুঝিয়েসুঝিয়ে ফেরত পাঠায় আবিরলাল—একটা সাইকেলও কিনে দেয় জামাইকে। তাতেও কিছু হয়নি। লোকটা নেশা-ভাঙ করত, মেয়েমানুষ পুষত আলাদা। বাচ্চা না হওয়ার অজুহাতে দু' বছরের মধ্যে একদিন মারধোর করে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। সেই যে বাপের বাড়ি চলে এলো সুখী আর ফেরত যায়নি। আবিরলালও জোর করেনি আর। গত ছ-সাত বছর গেরস্থবাড়িতে ঠিকে কাজ করে রোজগার করছে। সবই ইজ্জৎওলা ফ্যামিলিতে। সরল, ভালো মানুষ মেয়ে, তার ওপর যুবতী। যেখানে সেখানে দেয়া যায় না। এখন রমাপতির যদি আপত্তি না থাকে—

কী বলবে রমাপতি! ঈষৎ অন্যমনস্ক; সত্যি বলতে, সুখীর গল্পের মাঝখানেই সে চলে গিয়েছিল নিজের গল্পে—যেখানে আগে একবার বিয়ে হওয়া, ডিভোর্স একটি মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এমন কি হতে পারে যে সেই মেয়েটিরও—নামটা এখনো মনে আছে, মীণাক্ষী—সুখীরই মতো একটা অতীত ছিল? হয়তো সরাসরি নাকচ না করে কেসটা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারত! মীণাক্ষীকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে সে নিজে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা না নিলেও এটা ঠিক, ঘটনায় সমর্থন ছিল তারও। বিয়ে মানুষ একবারই করে, এই ধারণা থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত নিজেকে পুণ্য ও পবিত্র রেখেছে রমাপতি—এদিক-ওদিক কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে শরীর গরম হলে জর্দা পান কিংবা সিগারেট খেয়ে ঠাণ্ডা করেছে নিজেকে। এই ধরনের প্রস্তুতি থেকেই তখন তার মনে হয়েছিল, কারণ যাই হোক, খামোখা একটা সেকেণ্ড—হ্যাণ্ড মেয়েকে বিয়ে করবে কেন? এখন সুখীর ঘটনাটা শুনে

মনে হচ্ছে নতুন বা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ব্যাপারটা আপেক্ষিক, আসলে সুড়সুড়ি লেগেছিল তার পৌরুষে। কিন্তু, মেয়েদের ব্যাপারটা কে বুঝবে!

যাই হোক, রমাপতির প্রয়োজন এবং আবিরলালের ইচ্ছা এমনই এক বুদবুদ ফোটালো যে, ব্যাপারটার হিল্লে হয়ে গেল তখনই। পরের দিন সাত সকালে রমাপতির ঘুম ভাঙিয়ে সুখীকে নিয়ে হাজির হলো আবিরলাল। সাহেব তার মা-বাপ, মেয়েকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বলল, একেবারে দেবতা-বিশেষ। কাজে যেন ত্রুটি না থাকে।

তখনো ঘুম কাটেনি রমাপতির। ঘোরলাগা চোখে সুখীর দিকে তাকিয়ে ওর প্রথম যা রিঅ্যাকসন হলো তা এই রকম—এমন ভরা চেহারার মেয়ের দু' বছরেও বাচ্চা হয়নি কেন! তখন ভাবল, নিশ্চয়ই স্বামীটির দোষ ছিল কোনো। তারপর এই ভাবনার যাথার্থ্য ঠিক করার জন্যে নিজেকে একটু অলস করে গেরস্থালীর কাজে ব্যস্ত সুখীকে দেখতে লাগল নানা অ্যাঙ্গেল থেকে। ইতিমধ্যে সুখ ধরা দিচ্ছিল বুকে। রমাপতি না ভেবে পারল না যে, এক হিসেবে তার ও সুখীর জীবন একই ধাঁচে গড়া—বিয়ে ব্যাপারটা তাদের দু'জনের সঙ্গেই করে গেছে চূড়ান্ত প্রবঞ্চনা।

এই পর্যন্ত পড়ে পাঠক-পাঠিকাদের মনে যদি এমন কোনো সন্দেহ জাগে যে সুখী ও রমাপতি—দুটি প্রায় সমব্যথী চরিত্র নিয়ে চলেছে একটি রগরগে প্রেমের গল্প ফাঁদার চেষ্টা, নিশ্চিত ভুল করবেন তাঁরা। এটি প্রেমের গল্প নয়। আগেই বলা হয়েছে রমাপতি কনজারভেটিভ, কিন্তু হিপোক্রিট নয়—সামান্যতম দোষ স্খালনের জন্যেও সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকে মা-কালীর ছবি, চরিত্র ও মানসিকতায় খুঁত নেই কোনো। না, সে সুখীর প্রেমে পড়বে না বা এমন কিছু করবে না যাতে আমাদের চোখে তার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। আসলে এই মুহূর্তে তার আত্মতৃপ্তি বোধ করার কারণ গেঞ্জি-আণ্ডারওয়্যার ইত্যাদি নিয়ে; হৃদয় নিয়ে নয়।

এগোনো যাক। সুখী লেগে গেল কাজে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঝাঁটা ও ন্যাতা বুলিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল ঘরের মেঝে ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজটাই শেষ হলো রমাপতির বাথরুমে ঢোকা ও বেরিয়ে

আসার মধ্যে—রমাপতির অভিজ্ঞতায় দ্রুততম তৎপরতায়। আরও অবাক হলো রমাপতি, বলার অপেক্ষা না করেই ঝাড়ন দিয়ে জানলার কাঁচ পরিষ্কার করছে সুখী—যে-কাজটা করতে বললেই খিটখিট করত আগের বুড়ীটা। এই সব দেখতে দেখতেই চা বানাতে গেল রমাপতি। কেন কে জানে, আজ সে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই জল চাপালো। কেটলিতে জল ফোটার বিজবিজ শব্দ শুরু হতে তারও বুকের মধ্যে শুরু হয়ে গেল টিপটিপ, অপ্রয়োজনে পেয়ালা-পিরিচের শব্দ হতে লাগল, এবং চা তৈরি হয়ে যাবার পরও একটি যথার্থ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সে। দেখল, কয়েকদিনের জমেওঠা গেঞ্জি, আণ্ডারওয়্যার, রুমাল, পায়জামা, পাঞ্জাবি ইত্যাদির স্তূপ নিয়ে কলঘরের দিকে যাচ্ছে সুখী। না, এটাও ঠিক সেই মুহূর্তটি নয়, ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলো সুখী। কিচেনের ভিতরে রমাপতি. কিচেনের বাইরে থেকে কিছু বা আড়ষ্ট গলায় এই প্রথম কথা বলল সুখী, 'সাবুন কাঁহা—'

রমাপতি জানে না সাবান কোথায়। এসব ব্যাপারে সে একটু ভুলো—কী কিনতে হবে কী না যতোক্ষণ না ঠেকায় পড়ছে মনে পড়ে না তার। তাছাড়া, আগের লোকটি চলে যাবার পর থেকেই সে ডিপ্রেসনে ভুগছিল, খুঁটিনাটি এইসব মনে থাকার কথা নয়। এখন সামাল দেবার জন্যে দরকার কিছু উপস্থিত বুদ্ধির। রমাপতি তারই শরণাপন্ন হলো এবং বলল, 'সাবান নেই হ্যায় তো জলকাচ করদেও। পরে সাবান লা না।'

সুখী একটু তাকাল এবং মুখ নিচু করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাচ্ছিল, মনে সাহস এনে রমাপতি হঠাৎ বলে ফেলল, 'চা খায় গা?'

যেতে যেতে পিছনে তাকাল সুখী। একই সঙ্গে অস্বস্তি ও খুশীর হাসি ফুটল তার মুখে। বলল, 'আপ পিও—'

রমাপতি আবার সাহস করে বলল, 'ইধর চা হ্যায়, লে লেনা।'

নিজের কাপটা হাতে নিয়ে বেডরুমে চলে গেল রমাপতি। ইতিমধ্যে খবরের কাগজ এসেছিল—চায়ে চুমুক দিয়ে সেটায় মনঃসংযোগ করতে করতে টের পেল চা-টা সুবিধের হয়নি। বেশিক্ষণ ফোটানোর

জন্যেই সম্ভবত তিতকুটে লাগছে জিবে। এটাও ভুলতে সময় লাগল না। নিশ্চিন্তির ভাবটা এখন তাকে ছেয়ে ফেলছে পুরোপুরি। কলঘরে কাপড় কাচার শব্দে অভ্যস্ত হতে হতে, বিছানায় বাবু হয়ে বসে আরও নিশ্চিন্ত রমাপতি পুরোপুরি ডুবে গেল খবরে। আজ তার ঘুম ভেঙেছে তাড়াতাড়ি। সুতরাং ব্যস্ত না হয়েও অফিসে পৌঁছুতে পারবে ঠিক সময়মতো।

খেয়াল হলো অস্ফুট, রিনরিনে গলার আওয়াজে।

'সাব, চায়—'

চায়ের কাপ হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সুখী। পায়ে পায়ে এঁটে থাকা হাঁটুছুটো খুলে রমাপতি উঠে দাঁড়াবার আগেই চলে এলো ঘরের মধ্যে। কাপটা বাড়িয়ে ধরল রমাপতির দিকে।

তখনো চমকিত রমাপতি, ঠিক বুঝতে পারল না এই হঠাৎ চায়ের কারণ কি! বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, 'চা কোন মাঙা?'

সুখী হেসে ফেলল। চাপা ও মৃদু রেখায়—প্রথম দিনেই কি আর কেউ হি-হি করে হাসে! তারপর বলল, 'উয়ো চায় আচ্ছা নেহী থা—'

চায়ের কাপটা হাতে নিয়েও স্বাভাবিক হতে ভুলে গেল রমাপতি। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। দৃশ্যটি সিনেমা হলে এই সময়ে নেপথ্যে মিহি সুরের সারেঙ্গী বেজে উঠত। আগের চা-টা খারাপ হয়েছিল বলে এই নতুন ব্যবস্থা—তার মানে রমাপতির অপটু হাতকে প্রায় খোঁটা দিল সুখী, সেটা কিছু নয়। যতোদূর মনে করতে পারে রমাপতি, দিল্লিতে এই বাড়িতে আসবার পর এই প্রথম কেউ তাকে চা করে খাওয়াচ্ছে, সেটাও কিছু নয়। পর পর এই ছুটো ভাবনা সহজেই পার হয়ে গেল রমাপতি। ততোক্ষণে সে আঁটকে গেছে অন্য এক ভাবনায়। একটা গন্ধ পাচ্ছে। রুক্ষ ও বনজ, নিশ্চয়ই সুগন্ধ বলা যাবে না। চিনতে অসুবিধে হলো না। এর উৎস কাছাকাছি দাঁড়ানো সুখীর ময়লা, প্রায় চিট-ধরা শাড়ি-জামা, ঈষৎ কটা চুল ও স্নান না-করা শরীর। সম্ভবত তার তাকানোর ধরনটা বেআব্রু ছিল একটু, সুখী চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিল রমাপতি।

চুমুক দিল। চমৎকার!

কিন্তু ভাবনাটা থেকে গেল। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, মুখের গড়ন আর রঙও কিছু হেলাফেলার নয়। তবু, মেয়েটি এমন নোংরা কেন! তারপর নিজের প্রয়োজনেই যুক্তি সাজালো—সুখীর কাজ তার ঘরদোর ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা, নিজের শরীর বা পোশাক-আশাক নয়; এসব ভেবে সে এতো বিরত হচ্ছে কেন! তার সৌন্দর্যবোধ ঘা খাচ্ছে বলে? কিন্তু রমাপতির সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সুখীর কী সম্পর্ক! ইত্যাদি ভাবনাগুলি থেকেই গেল। রমাপতির স্বভাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য, ঠিক-ঠিক উত্তর না-পাওয়া পর্যন্ত যে-কোনো ভাবনাই তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

কিন্তু, এই গল্পটি শুধু রমাপতিকে নিয়ে নয়, সুখীকে নিয়েও। শিক্ষিত, রুচিবান এবং মোটামুটি বড়ো চাকুরে রমাপতির ধরনধারণের সঙ্গে স্বামী-পরিত্যক্তা, অশিক্ষিতা এবং গরীব এই যুবতীটির ধরনধারণে যে মিল থাকবে না কোনো, এটা বলাই বাহুল্য। তাহলেও, সুখীরও আছে একটি নিজস্ব ধরন। সেই ধরনের ছাপ ক্রমশ পড়তে লাগল রমাপতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়।

একেবারে নিশ্চিন্ত বলতে যা বোঝায়, কিংবা ফুরফুরে, সুখী কাজে লাগবার মাসখানেকের মধ্যেই সেই অবস্থায় পৌঁছে গেল রমাপতি। সকালের চা আর ব্রেকফাস্টটা এখন আর সে নিজের হাতে করে না। রাতের খাবারও তৈরি থাকে বাড়িতে—যদিও সেটা পরিবেশনের জন্মে সুখী থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। গ্যাস জ্বেলে একটু-আধটু গরম করে নিলেই হলো। এই পরিশ্রমটুকুও ভুলিয়ে দেয় রান্নার স্বাদ। রমাপতির ঘরদোর এখন সারাক্ষণই পরিপাটি থাকে। গেঞ্জি, আণ্ডারওয়্যার, রুমালে দাগ পড়ে না এতোটুকু। প্রয়োজনে লন্ড্রি থেকে ফিরে আসা সার্টের ছেঁড়া বোতামটিও বদলে যায় ঠিকঠাক। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, মাকে দিল্লিতে নিয়ে আসার জন্যে আর ছটফট করে না রমাপতি। বরং শেষ চিঠিতে লিখেছিল, বাচ্চা হয়ে গেলেও বৌদি আর নবজাতটিকে এখন কিছুদিন চোখে চোখে রাখা ভালো। উত্তরে মা লেখে, তোমার জন্য

উপযুক্ত পাত্রী খুঁজিতেছি। মা কালীর দয়ায় সামনের বৈশাখের মধ্যেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। খুব একটা গা করে না রমাপতি। শুধু মাঝে মাঝে পুরনো একটা জ্বালা অন্য একরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে শরীরে। এলো-মেলো কুচিন্তায় চুলকে ওঠে নাকের পাটা, কানের পিছনে, নাভির নিচে কিংবা পায়ের তলায়। সুখী সামনে এলেই গন্ধটা টের পায়। স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে তখনই ভাবনায় ডুবে যায় রমাপতি।

সুখীও কি খারাপ আছে? না। এমন সদাশিব মনিব পাওয়া দুর্লভ—সুখীর মনের এই কথাটি যথাসময়েই রমাপতিকে জানিয়ে দিয়েছিল আবিরলাল। ততোদিনে আগের তিনটি ঠিকে কাজের একটি ছেড়ে দিয়ে রমাপতির বাড়িতে বিকেলের কাজকর্মটাও সেরে দিতে শুরু করেছে সুখী। সদরের একটি চাবি নির্ভাবনায় তার হাতে তুলে দিয়েছে রমাপতি। কড়া ধাতের বাপ আবিরলাল, সন্ধ্যের পর যুবতী মেয়ের বাড়ির বাইরে থাকা পছন্দ করে না। শনি কিংবা রবিবার ছাড়া অন্যদিন যতোই তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরুক রমাপতি, দরজায় তালা দেখে বুঝতে পারে চলে গেছে সুখী। কিন্তু, দরজা খুলে ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপাটি সেবার ছাপ টের পায় সর্বত্র। টাকার বিনিময়ে কেনা হলেও দিব্যি বুঝতে পারে রমাপতি, তার প্রায়-নিঃশব্দ সেবার মধ্যে অল্প একটুখানি আন্তরিকতাও লুকিয়ে রাখে সুখী।

এই পর্যন্ত যাঁরা অনুসরণ করেছেন গল্পটি, এবার অবশ্যই তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দেবে—বোঝা গেল রমাপতি আর সুখী দু'জনেই গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা এবং ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু, এই গল্পের নাম 'সাবান' কেন? তাঁদের অবগতির জন্যে আগেভাগেই জানানো দরকার যে সাবান আছে এবং যথাসময়েই দেখা দেবে। কিন্তু, তারও আগে আছে আরও কিছু কিছু ব্যাপার। মনে রাখা দরকার, এই গল্পের শুরু হয়েছে রমাপতির আবিষ্কার দিয়ে। এবং এই আবিষ্কারটি ঘটেছিল ফাল্গুন মাসের এক ছুটির দিনে।

শীতের গোড়ায় এসেছিল সুখী। দেখতে দেখতে চলে গেল শীত।

হাওয়ায় এখন অন্যরকম টান, যাকে বলে পরিচ্ছন্ন সুবাতাস। এক-এক ঝলকে জুড়িয়ে দেয় মন এবং শরীর, কখনো বা করে তোলে উত্যক্ত। এক-একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাংলোর বাইরে বারান্দায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে থাকতে থাকতে হাওয়ার দাপটে ছটফট করে ওঠে রমাপতি। টের পায় একটা অভাব নিংড়ে যাচ্ছে তাকে। আগ বাড়িয়ে কিছু লেখে না মাকে। তবু, মনে মনে হিসেব করে—এটা ফাল্গুনমাস, বৈশাখের আর কতো দেরি! এইসব ভাবনায় কাতর হতে হতে এক-একদিন সুখীর হাতের খাবারও বিস্বাদ লাগে মুখে। তাড়াতাড়ি বিছানায় ছুটে যাওয়া ছাড়া তখন আর উপায় থাকে না কোনো।

একদিন সকালে বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে রমাপতি, সুখী হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়ালো। এই মুহূর্তে কী দরকার তার!

'সাব—', রমাপতি সোজাসুজি তাকাতেই দ্বিধায় জড়িয়ে গেল সুখী। থেমে থেমে বলল, 'কাল হোলিকা দিন। ছুট্টি লেনা হ্যায়—' ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিল রমাপতি। তারপর হেসে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক হ্যায়। নেহি আনা—।

সুখী গেল না তবু। বরং এমন চোখে তাকালো রমাপতির দিকে যার অনেক রকম অর্থ হতে পারে। রমাপতির অসুবিধে সে এতো কম মেয়ে দেখেছে এবং তার চেয়েও কম মেয়ের সঙ্গে মিশেছে যে একই দৃষ্টির অনেক রকম মানে করে নেয়। অবশ্য সেজন্যে সুখীরও যে খুব একটা মাথা ব্যথা ছিল তা নয়। সময় নিয়ে বলল, 'খানা ঠাণ্ডা মেশিনমে রহে গা, গরম কর লেনা—'

সম্ভবত মেয়েটির প্রতি তার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত, সেদিন অফিসে যেতে যেতে ভাবল রমাপতি। কাল হোলি, সুখী আসবে না। উৎসবের দিনে তার কি কিছু বখশিস করা উচিত ছিল? আফটার অল, সে মনিব। সুখী তাকে কৃপণ ভাবল না তো! এই ভেবে অল্প অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রমাপতি। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে এক ফাঁকে ডেকে পাঠালো আবিরলালকে। তারপর ব্যাগ থেকে একশো টাকার একটা নোট বের

করে বলল, 'কাল হোলি। তুমহারা লড়কিকো এক শাড়ি খরিদ দেনা।'

অভিভূত আবিরলাল। নোটটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করল, খুলল, আবার ভাঁজ করল এবং খুলল। তারপর চকচকে চোখে তাকিয়ে কোনো কথা না বলে ঔরঙ্গজেবের সময়ের পেয়াদাব কুর্নিশ ঠোকার ভঙ্গিতে পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি এক-একজনের এক-একরকম হয়। হয়তো একটু বেশিই দেওয়া হয়ে গেল, কিন্তু, রমাপতি ভাবল, সে নিজেও একটু বেশি হাল্‌কা হয়ে গেল না কি! তার চেয়ে বড়ো ব্যাপার, প্রপার চ্যানেল দিয়ে গেছে সে। হয়তো সুখীর হাতে এইভাবে টাকাটা তুলে দেয়া বেমানান হতো।

হোলির দিন গোটা সকালটা নিরসভাবে কাটালো রমাপতি। ইচ্ছে করেই দেরিতে উঠেছিল। অনেক দিন পরে নিজের হাতে চা তৈরি করে, খবরের কাগজে এলোমেলো চোখ বোলাতে বোলাতে শুনছিল চারিদিকে উৎসবের শব্দ। রঙের বালতি ও পিচকারি হাতে দোল খেলতে নেমে পড়েছে প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা, তার শব্দ। কাছেই কোথাও ঢোল, খঞ্জনি বাজিয়ে চেঁচিয়ে হোলিগান করছে একদল লোক, তার শব্দ। বিচিত্র, চঞ্চল এইসব শব্দ ক্রমশ নিঃসঙ্গ ও মুহ্যমান করে তোলে তাকে— বেঁচে থাকার অনেকটাই যে সঙ্গ-নির্ভর, এটা সে এখন উপলব্ধি করছে পুরোপুরি। একই সঙ্গে আসছে বিরক্তি। নিজেকে আলাদা করে রাখার প্রবণতায় সব রকমের সামাজিকতা মুছে গেছে তার স্বভাব থেকে। বেশ কয়েক মাস ধরে আছে এই পাড়ায়; কিন্তু কারুর সঙ্গেই মেলামেশা হয়নি কোনো। এইরকম নানা ভাবনায় ডুবে যেতে যেতে বাথরুমে গেল রমাপতি। দাড়ি কামাবার পর আফটার-শেভ লোশনের শিশিটা হাতের তেলোয় উপুড় করে দেখল, শূন্য। ক্ষোভে শিরশির করে উঠল শিরদাঁড়া। কাল বিকেলেই অফিস থেকে ফেরার সময় নিজের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসগুলো কিনে আনবে ভেবেছিল, অন্যমনস্কতায় ভুলে গেছে একেবারে। দোষটা নিজেরই। চারিদিকে রঙের মাতামাতির মধ্যে এখন আর বেরুনো সম্ভব নয়। বিকেলে দোকানপাট খুলবে, তখন দেখা যাবে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, খেয়ে, আবার চলে গেল বিছানায়। আজ বেশ গরম। ফ্যানটা ফুলস্পীডে ঘুরিয়ে, মাথার কাছে রাখা আধপড়া বইটা হাতে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। যদি ঘুম আসে ভালো, না হলেও শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতে পারবে।

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েই পড়ল। কাটাছেঁড়া ঘুম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশ্রাম পেয়ে ও স্বাস্থ্যে চর্বি জমে উঠলে যেরকম হয়, শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে এপাশ ওপাশ করা ছাড়া উপায় থাকে না কোনো। কিন্তু, কেউ কি ডাকছে তাকে? স্বপ্ন! দোটানায় ছটফট করতে করতে বিছানায় উঠে বসতেই বজ্রাহত হলো রমাপতি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সুখী! দেখল, রোদ পড়ে এসেছে বাইরে, সকাল-দুপুরের শব্দগুলিও হারিয়ে গেছে কখন।

প্রাথমিক ঘোর কেটে যেতে পায়জামা পাঞ্জাবিটা টেনেটুনে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো রমাপতি।

প্রায় তখনই ঘটে গেল অদ্ভুত একটা ব্যাপার! সুখীর হাতে পুঁটুলি-করা রুমাল, তার ভিতর থেকে মুঠো ভর্তি আবির বের করে নির্দ্বিধায় ঘরের মধ্যে চলে এলো সুখী—নিমেষে ঝুঁকে পড়ে আবির মাখাতে লাগল রমাপতির পায়ে। রমাপতি একটা গন্ধ পেল, রুক্ষ ও বনজ, সুগন্ধ বলা যাবে না, তবু গোলমাল করে দেয় নিঃশ্বাস। ভিতর থেকে উঠে এলো একটা কাঁপুনি, সেটা সহ্য করতে করতে হঠাৎই আবিষ্কার করল রমাপতি, মেয়েটির প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে ক্রমশ। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আজ ছুট্টি দিয়া থা না!'

ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সুখী। নিকট সান্নিধ্য থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এক পা দূরত্বে। গোটা মুখে সাবলীল খুশী ছড়িয়ে শাড়ির আঁচলটা তুলে ধরল রমাপতির সামনে।

'বাবা এ শাড়ি খরিদ দিয়া, সাব।'

আচ্ছন্নতা ছিল বলেই সম্ভবত এতোক্ষণ খেয়াল করেনি রমাপতি। এবার দেখল টকটকে লাল রঙের ওপরে কালো বুটিদার নতুন শাড়ি

উঠেছে সুখীর গায়ে—ব্লাউজটা যদিও পুরনো ও চিট-ধরা, রুক্ষ চুলে আবিরের গুঁড়ো ছড়ানো, অল্প ঘামে ভেজা গলার খাঁজে সরু সুতোর মতো ময়লা—উত্তেজনা কিংবা খুশীতে ওঠানামা করছে বুক।

কে জানে কেন, হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল রমাপতির। জীবনে এই প্রথম নিজেকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টায় অসম্ভব শারীরিক তৎপরতায় সুখীর হাতটা চেপে ধরল সে, তারপরেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। সুখীও, কে জানে কেন, বাধা দিল না। অবশ্য বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিনা সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মুহূর্ত সেটা নয়। রমাপতি নয়, দেরাদুনের এক্কা গাড়ির গাড়োয়ানও নয়, আস্ত একটা বাঘ তখন মুখ চেপে ধরেছে সুখীর কাঁধে।

কিন্তু, হায়, চরিত্র! মুহূর্তের মধ্যেই—সুখী নয়, নিজেরই প্রখর সৌন্দর্যবোধ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রমাপতিকে। যে-গন্ধটা এতোদিন ছিল দূর ও অস্পষ্ট, সুখীর কাঁধে নাক ডোবানো মাত্র সেটা এমন প্রবলভাবে উঠে এলো যে সহ্য করতে পারল না রমাপতি—ঘা খেয়ে আলাদা করে নিল নিজেকে। এবং অস্বস্তিকর এক শারীরিক অবস্থার মধ্যে অনুভব করল, পটভূমি প্রস্তুত, কোথাও কোনো অসুবিধে নেই; তবু তার ও সুখীর মধ্যে প্রতিরোধের দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়েছে ওই গন্ধটা!

ঘটনার আকস্মিকতাই সম্ভবত সুখীকে ততোক্ষণে বসিয়ে দিয়েছে বিছানায়। ঈষৎ এলোমেলো। লজ্জা জড়ানো, বিব্রত মুখ। কিন্তু, ভীত বা ক্ষুব্ধ যে নয়—ওর ব্যস্ততাহীন বসে থাকার ভঙ্গিতেই তা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। ওকে দেখতে দেখতেই নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করে ফেলল রমাপতি এবং ভাবল, আজকের সমস্ত আয়োজনটাই তার ও সুখীর জন্যে—তা না হলে ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও তার ঘুম ভাঙাতে এইভাবে ছুটে আসত না সুখী। গন্ধটাই যা অসুবিধে করছে মাঝখান থেকে। কিন্তু সে হার স্বীকার করবে না। সুখীকে গ্রহণ করবার আগে তার চিট-ধরা, ময়লা শরীরে এনে দেবে পরিচ্ছন্নতা। সেজন্যে দরকার একটা সাবান, সর্বাঙ্গে সুগন্ধ সাবানের কিছু প্রলেপ আর নির্মল জলে স্নান। কিছুক্ষণের

ব্যাপার মাত্র। সুখী বাথরুম থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।

এইসব ভেবে স্নানের আয়োজন করতে বাথরুমে ছুটে গেল রমাপতি। কিন্তু, আজ তার কপাল ভালো-মন্দে মেশানো। সোপকেসের ঢাকা খুলতেই দেখল, সেখানে চন্দন সাবানের পাতলা এবং ক্ষয়া ছোট একটা টুকরো পড়ে আছে শুধু। সকালেই দেখেছিল। এখন উপায়? ঝটপট একটা নতুন সাবান কিনে আনলেই তো হয়!

প্রয়োজন ঝড় এনে দিল রমাপতির বুকে। না, সে হার স্বীকার করবে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার ছুটে গেল বেডরুমে। নতমুখে সুখী এখনো বসে আছে ঠিক সেই ভঙ্গিতেই, যে-ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ আগে তাকে রেখে গিয়েছিল রমাপতি। একবার সুখীর দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিল রমাপতি, চপ্পলটা গলিয়ে নিল পায়ে। সুখীকে বলল, 'চলা নেহি যা না—হাম আভি আয়ে গা—'

সুখী কেঁপে উঠল যেন। অন্যরকম গলায় বলল, 'দেরি হোনে সে বাবা ডাঁটেগা, সাব!'

'কুছ নেহি হোগা—', বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল রমাপতি।

তাদের রাস্তা যেখানে বড়ো রাস্তায় পড়েছে সেইখানেই দোকানটা। রমাপতির চেনা। সেই পর্যন্ত অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হেঁটে গিয়ে দেখল, বন্ধ। দোকানের সামনে বাইরে জলচৌকির ওপর আবিরের প্যাকেট সাজিয়ে বসেছে একটা লোক। জিজ্ঞেস করতে বলল, 'আজ দুকান নেহি খুলেগা, সাব। হোলিকা বন্ধ্—'

ব্যস্ত গলায় রমাপতি জিজ্ঞেস করল, 'সাবুন কিধর মিলেগা?'

'আগে—মেন রোড মে দেখিয়ে—'

রমাপতি ঘড়ি দেখল। মাত্র পাঁচ মিনিট গেছে ইতিমধ্যে। মেন রোডে অনেকগুলো স্টেশনারী দোকান আছে, যাতায়াতের রাস্তায় প্রায়ই চোখে পড়ে। হোলির তামাশা মিটে গেছে, এখন বিকেল, একটা না একটা নিশ্চয়ই খোলা পাবে। সুখীও নিশ্চয়ই তার ফিরে আসা পর্যন্ত

অপেক্ষা করবে। সাবানটা পাওয়া খুবই জরুরি। এইসব ভেবে ছটফটে চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মেন রোড ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল রমাপতি। এবং হাঁটতে হাঁটতেই অনুভব করল, সাবানের স্বচ্ছ, ফেনিল, অদ্ভুত স্বপ্নময় সুগন্ধে ক্রমশ ভরে উঠছে তার চারিদিক।

আ বি র্ভা ব

প্রিয়নাথরা যে গরীব, দিন চালায় কায়ক্লেশে, এটা সকলেই জানত। যে-পাড়ায় ওরা থাকত সেই পাড়ার মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। তাদের স্বাচ্ছল্যের সঙ্গে অবশ্য কোনো তুলনাই চলত না প্রিয়নাথদের। তবে স্বচ্ছল মানেই তো আর খারাপ নয়। পাড়ার যারা পুরোনো বাসিন্দা এই গরীব পরিবারটিকে তারা আগলে রাখত ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে। নতুন কেউ এলেও চেষ্টা করত চিনিয়ে দিতে, যাতে প্রিয়নাথদের প্রতি তারাও হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল।

এমনতর পরিবেশে গরীব হওয়ার সুবিধা আছে। পাড়ার যে-কোনো বাড়িতে উৎসবের উপলক্ষ থাকলে এবং খাওয়া দাওয়া হলে লিস্টের সবচেয়ে ওপরে নাম থাকত প্রিয়নাথদের। দু'ঘরের সংসারে স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঠাসাঠাসি করে থাকা—দরজা খুললেই খসে পড়ে আব্রু। ব্যাপারটা সকলেই জানত বলে কেউই আর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করত না। দরজায় দাঁড়িয়েই বলত, সামনের রবিবার আমার বড়ো ছেলের বিয়ে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই আসবে—, ইত্যাদি। প্রিয়নাথ বা তার স্ত্রী শ্যামা বলত, একটু বসে যাবেন না? সকলেই জানত এটা ভদ্রতার কথা। বলত, না, না। এখন অনেক জায়গায় যেতে হবে তো! বরং আর একদিন—। তারপর বলত, শুধু রাত্রে নয়, দিনের বেলাতেও আসবে সকলে, খাবে—

প্রিয়নাথের তিন ছেলেমেয়ের বড়ো দু'টির বোধবুদ্ধি হয়েছে কিছুটা। আড়ালে থেকে এইসব কথোপকথনে কান দিত ওরা এবং আহ্লাদে আটখানা হতো যখন শুনত দু'বেলারই নেমন্তন্ন পেয়েছে তারা। ওদের লোনাঝরা আহ্লাদ প্রত্যক্ষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলত শ্যামা। আর প্রিয়নাথ?

দীর্ঘশ্বাস না ফেললেও একরকম বোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত সে। ক্ষুধা ও খাদ্যের সম্পর্কটা গোলমাল হয়ে যেত মাথার মধ্যে।

তবে এই কাঙালপনায় শুধুই যে দুঃখ ছিল তা নয়। কিছু মজাও ছিল। অভাবের সংসারে যেদিন কোনো কারণে হাঁড়ি চড়ত না বা শুধুই ভাতে ভাত হতো, প্রিয়নাথের ছেলেমেয়েরা সেদিনও খাবার জন্যে বায়না করত না কোনো। সেদিন কবে, কোথায়, কাদের বাড়িতে কী কী ভালো খাবার খেয়েছে এই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠত তারা এবং বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্পর্কিত আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

এই ধরনের কাঙালপনা পছন্দ হতো না প্রিয়নাথের। গোড়ার দিকে তো অপমান লাগত রীতিমতো। কিছুতেই ভুলতে পারত না সে এম-এ পাশ, সুতরাং শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক। কিন্তু তার পরেই ভাবতে বাধ্য হতো, কী হলো এসব তকমায়! মানুষের বিচার হয় অর্থ ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে —এই দুটোর কোনোটাই পায়নি সে। কোনো চাকরিতেই পার্মানেণ্ট হয়নি, কোনো কাজেই এঁটে বসতে পারেনি। নির্দিষ্ট কোনো কাজ করতে না পারায় এখন সে অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে করবার চেষ্টা করে এবং কোনোটা থেকেই সেরকম উপার্জন করে না। টাকার দাম কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের দামও কমে গেছে অনেক—সংসারের কোনো ইচ্ছাই পূরণ করতে পারে না। এই অবস্থায়, তার সক্রিয় চেষ্টা ছাড়া ইচ্ছাগুলি যদি পাড়া প্রতিবেশীরাই পূরণ করে দেয়, তাতে সে বাধা দেবে কোন সাহসে!

ভাবনাটা একটা আপোষ শিখিয়ে দেয় প্রিয়নাথকে। নিজে শেখার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকেও ব্যাপারটা শিখিয়ে দেয় সে। আপোষটা হলো, নেমন্তন্ন পেয়ে কাঙাল ছেলেমেয়েগুলোকে ক্ষুধা নিবৃত্তিতে পাঠালেও সে বা শ্যামা যুগ্মভাবে কখনো তাদের সঙ্গী হতো না। অর্থাৎ কখনো প্রিয়নাথ যেত, কখনো শ্যামা। যে যেত না সেদিন সে অসুস্থ থাকত। এইভাবে লোকের চোখে না হলেও নিজেদের চোখে তারা পুরোপুরি কাঙাল হওয়া ঠেকিয়ে রাখত।

কিন্তু, শুধু খাবার জন্যেই যে ডাক পড়ত তাদের তা নয়। পাড়ায় কোনো বাড়িতে কোনো মান্যিগন্যি বা বড়ো মানুষ এলেও ডাক পড়ত তাদের। যারা ডাকত, বড়োমানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে তারা বলত, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, আমাদের খুব প্রিয়জন। বড়ো ভালো মানুষ। এই ওর স্ত্রী শ্যামা। আর এরা—ভুনি, টাকু, বিনি—ওদের ছেলেমেয়ে। বলত, চুপ করে কেন, প্রিয়নাথ! আলাপ করো ওঁর সঙ্গে। তুমি তো অনেক কিছু জানো। এসব কথায় বিলক্ষণ লজ্জা পেত প্রিয়নাথ, কথা ফুটত না মুখে। কোলের ওপর জড়োসড়ো হাত দুখানি রেখে ও দেখত বড়ো মানুষটির সান্নিধ্য পাবার জন্যে অনেকেই ঘুরঘুর করছে আশেপাশে, কিন্তু সান্নিধ্য পাচ্ছে শুধু তারাই। ভুল করে হলেও কখনো সে নিজেকেই বড়ো মানুষ ভেবে ফেলত।

বাড়ি ফিরে বড়ো মানুষের গল্প করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ত ভুনি, টাকু, বিনি। তখন সে ও শ্যামা বড়ো মানুষ নিয়ে সাধারণ গল্প ছেড়ে ঢুকে পড়ত বিশেষ গল্পে। তারপর তারাও ঘুমিয়ে পড়ত।

এইভাবেই একদিন একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলল শ্যামা।

'পয়সা নেই বলে আমরা না হয় কাউকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে পারি না। কিন্তু একজন বড়ো মানুষকেও কি ডাকতে পারি না কোনোদিন?'

প্রিয়নাথ কথাগুলি শুনল, কিন্তু আমল দিল না কোনো। শুধু বলল, 'কোন বড়ো মানুষটিকেই আর চিনি আমরা!'

'কেন! তোমার সেই হ-বাবু, তিনি তো বিখ্যাত হয়েছেন!'

'হ-বাবু!' মনে করার ধরনে প্রিয়নাথ বলল, 'হ্যাঁ, তাঁকে এখন বড়ো মানুষ বলা যেতে পারে।'

'এককালে তাঁর জন্যে তুমি অনেক খাটাখাটি করেছ, তাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করেছ!' শ্যামা বলল, 'বিয়ের পরও অনেকদিন তুমি তার গল্প করতে। একদিন এসেও ছিলেন, মনে আছে?'

প্রিয়নাথ বলল, 'তখনো তিনি বড়ো হননি। সেসব অনেক বছর

আগেকার কথা। এখন হয়তো মনেই নেই আমাকে—যেখানে পৌঁচেছেন সেখানে তাঁর পাশে অনেক অনেক অন্য মানুষ। আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন না। চেহারাটাও কতো বদলে গেছে আমার!'

শ্যামা বলল, 'যে-সিঁড়ি দিয়ে উঠল সেই সিঁড়িটাই ভুলে যাবে, এমন হয় না কি!'

'তা হয়তো হয় না।' প্রিয়নাথ বলল, 'তবে আমাকে সিঁড়ি ভাবা ভুল। হয়তো সিঁড়ির একটা ইট—হয়তো তাও নয়।'

'এগুলো তোমার ধারণার কথা। সামনে গিয়ে পড়লে ঠিকই চিনতে পারবেন।'

ভুনি তার ফ্রকে হাঁটু ঢাকতে ঢাকতে বলল, 'কোন হ-বাবু, মা, যাঁর নাম কাগজে বের হয়?'

'হ্যাঁ। এককালে তোর বাবার খুব চেনাশোনা ছিল। বয়সে যদিও বড়ো, অনেকটা বন্ধুর মতো—'

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় খুব শ্রদ্ধা সহকারে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল ভুনি। তারপর বলল, 'একদিন তাঁকে নিয়ে এসো না, বাবা? আমরা দেখতাম, অন্যদেরও দেখাতাম!'

'বাড়িতে!' প্রিয়নাথ বলল, 'এই বাড়িতে কাউকে ডাকা যায়, মা?'

'বাড়ির দোষ দিচ্ছ কেন! নিয়ে এসো। তারপর দেখো এই বাড়িই ধুয়ে নিকিয়ে কেমন ঝকমকে করে দিই। আজকাল কেউই আমাদের বাড়িতে ঢোকে না। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে, যেন চিড়িয়াখানার জন্তু!'

প্রিয়নাথ জবাব দিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল শুধু। ভাবল, খাঁচাটা ভাগ্যের দান; দোষ যারা দেখে তাদের নয়।

শ্যামা বলল, 'যে-কোনো বড়ো মানুষের পায়ের ধুলোই মঙ্গল আনে সংসারে।'

একজন বড়ো মানুষকে বাড়িতে নিয়ে আসার ভাবনাটা ঘুরপাক খায় মাথায়; বদ্ধ বদ্ধ দু'টি ঘরের আনাচে কানাচে। তাঁকে নিয়ে আলোচনা

করে শ্যামা আর তুনি। খবরের কাগজে বেরুনো হ-বাবুর একটা ছবি কেটে দেয়ালে সেঁটে রাখে টাকু। বড়ো মানুষ—বড়ো মানুষ, অন্তর্নিহিত গুঞ্জনে ছড়িয়ে পড়ে চাপা উত্তেজনা, মনে হয় পুজো আসছে। কবে, কখন, এ-সবের হদিশ থাকে না যদিও।

ঠিকানা খুঁজে একদিন সকালে হ-বাবুর বাড়িতে পৌঁছে গেল প্রিয়নাথ। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মিলিয়ে নিল নিজের কল্পনার সঙ্গে। ভাবল, বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারও আসে। এই বাড়ি তারই নিদর্শন। এতোদূর উচ্চতায় পৌঁছতে ইঁট-সুরকির সিঁড়ি কাজ দেয় না, স্বর্গের সিঁড়িই দরকার হয় বুঝি বা। তবু, নিজেকে সেই সিঁড়িরও একটা ইঁট ভাবতে ভালো লাগল প্রিয়নাথের। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগে এক দুঃসময়ে তার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিলেন হ-বাবু, টাকাটা ফেরত দেবার সুযোগ পাননি। তখনকার পঞ্চাশ টাকার দাম আজ কয়েকগুণ হবে। সে যেভাবে ভাবে, হ-বাবু নিশ্চয়ই সেভাবে ভাবেন না। এখন তাঁর অনেক টাকা। ধারের কথাটা মনে পড়লে লজ্জা পাবেন নিশ্চিত।

বাড়িতে ঢুকে হলঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা লোকগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বুঝতে পারল এরা সকলেই দর্শনপ্রার্থী; অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। হয়তো তাকেও অপেক্ষা করতে হবে।

একটি লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

বিনীতভাবে প্রিয়নাথ বলল, 'হ-বাবুর সঙ্গে দেখা করব একটু।'

'আপনার নাম?'

'প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। অনেককালের চেনা, নাম বললে চিনতে পারবেন।'

লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, 'লোক আছে। বসতে হবে।'

প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়ল। ভাবল, ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক।

প্রায় আধঘন্টা পরে লোকটি ফিরে এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে।

দোতলার হলঘরের কোণায় একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন হ-বাবু। সোফার একদিকে তাকে বসিয়ে দিয়ে লোকটি চলে যাবার পর মুখোমুখি হলো প্রিয়নাথ।

হ-বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

'চিনতে পারছেন? আমি প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। মেসে একসঙ্গে থাকতাম।'

'নাম শুনে বুঝিনি।' সূক্ষ্মভাবে হাসলেন হ-বাবু, 'চেহারায় চেনা লাগছে। একটু একটু মনেও পড়ছে—'

কৃতার্থ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল প্রিয়নাথ।

'কী করা হয় এখন?'

'আজ্ঞে, বিশেষ কিছু নয়। দু'তিনটে টিউসন করি, পোস্টাপিসে মানি অর্ডার, চিঠি লিখে দিই। পাকা কিছু আর হলো কোথায়! কষ্টেই আছি—'

কথা শেষ করার আগেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ হলো প্রিয়নাথ।

'চাকরির খোঁজে এসেছ?'

কুঁজো-হওয়া ঘাড়ে ছোট্ট একটা ঘা লাগল প্রিয়নাথের। তার পরেই অবশ্য ভাবল, আজ তাঁর যে-অবস্থা, সম্মান, প্রতিপত্তি, তাতে এ-ধরনের ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। এরকম অনেকেই হয়তো নিত্য আসে যায় হ-বাবুর কাছে এবং তাদের অনেকেই চাকরি-টাকরি চায়। দোষ হ-বাবুর নয়। তখন চোখ তুলে বলল, 'সেজন্যে আসিনি। আমার ছেলেমেয়েদের ভারী শখ একদিন আপনাকে দেখে। যদি একদিন পায়ের ধুলো দেন আমাদের বাড়িতে—'

'ছেলেমেয়ের শখ! নাকি ইমেজ বাড়াতে চাও?'

'আজ্ঞে!' থতমত খেয়ে বলে উঠল প্রিয়নাথ, 'তা নয়। গরীবের ইমেজ কী আর বদলায় কিছুতে!'

'ঠিক। ঠিকই বলেছ।' হাসলেন হ-বাবু, 'তবে এসব শখ মেটানোর সময় কোথায় বলো! পৃথিবীর মজাই হলো যারা শখ মেটাতে চায়

তাদের চেয়ে যারা শখ মেটাবে তাদের সংখ্যা অনেক কম। সময় কোথায়!'

প্রিয়নাথ চুপ করে থাকল।

'থাকো কোথায়?'

'সেই বাড়িতেই। আপনি গিয়েছিলেন একবার—অনেক বছর আগে—'

'বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিল না?'

'এখন নেই। এখন সেখানে তিনতলা বাড়ি উঠেছে।'

'ঠিকানাটা রেখে যাও।' চিন্তিতভাবে বললেন হ-বাবু, 'কথা দিচ্ছি না। সময় কোথায়! তবে ছেলেমেয়ের নাম করে বললে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কখনো ওদিকে গেলে একবার ঢুঁ মারার চেষ্টা করব।'

'কবে?'

'সে কি বলা যায়! যে-কোনো একদিন। তবে—কথা দিচ্ছি না—'

না-বোঝা কিছু আশা এবং কিছু হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরল প্রিয়নাথ।

শ্যামা জিজ্ঞেস করল, 'দেখা হলো?'

প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়ল।

'কী বললেন গো? আসবেন?'

'আসতেও পারেন। তবে ব্যস্ত মানুষ তো! কবে আসবেন কিছুই বললেন না।'

'তোমার কী মনে হলো?'

'আগে হলে বলতে পারতাম। এখন অনেক বদলে গেছেন—বড়ো মানুষই শুধু নন, দূরের মানুষও। পুরোপুরি অচেনা লাগল। ইচ্ছে হলে আসবেন—ঠিকানাটা নিলেন—'

'তাহলে নিশ্চয়ই আসবেন।'

শ্যামার ইচ্ছায় এবং ভুনি, টাকুর লাফালাফিতে কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল পাড়ায়—হ-বাবু আসবেন প্রিয়নাথদের বাড়িতে। অনেকেই বিশ্বাস করল এবং তাঁর আবির্ভাবের দিন, ক্ষণ সম্পর্কে কৌতূহল দেখাতে শুরু করল। যারা বিশ্বাস করল না, প্রিয়নাথদের প্রতি

ভালোবাসা হেতু তারা বলাবলি করল, বাজে কথা। প্রিয়নাথদের বাড়িতে আসবার মতো সময় কোথায় তাঁর! ওটা কথার কথা।

শ্যামা, ভুনিদের বিশ্বাসে চিড় ধরল না তবু। যবেই আসুন, বড়ো মানুষের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বাড়তি উৎসাহ নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল শ্যামা। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ করল প্রিয়নাথ, ঘরদোরের চেহারা ফিরে গেছে তার। পুরোনো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে যা-কিছু সঞ্চয় ছিল তাই দিয়ে সস্তার কাপড় কিনে পর্দা বদলেছে জানলার; তাদের বিয়ের ছবির ঘুণধরা ফ্রেমটা পাল্টিয়ে লাগিয়েছে নতুন ফ্রেম। শ্রীযুক্ত এই ঘর-দোর মেঝের দিকে তাকালে কেউই আর তাদের গরীব ভাববে না। মনে মনে খুশী হলেও একটা আশঙ্কাও পেয়ে বসল তাকে।

একদিন স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এসব যেমন ছিল তেমন থাকলেই হতো। হ-বাবু এলেই কি জীবন বদলে যাবে?'

'তা হয়তো বদলাবে না। তবে মানুষের দয়া থেকে তো বাঁচা যাবে।'

'হ-বাবু এলেও দয়া করেই আসবেন।'

চুপ করে থেকে কিছু ভাবল শ্যামা। তারপর বলল, 'বড়ো মানুষের দয়ায় পুণ্য থাকে। যদি আসেন, বুঝব ভাগ্য। সকলের বাড়িতে তো আর পা পড়ে না তাঁর!'

'তা অবশ্য ঠিক।' প্রিয়নাথ বলল, 'না এলে সবাই হাসবে। এখনই হাসছে অনেকে--'

'ঈর্ষায়!'

হয়তো ভুল বলেনি শ্যামা, প্রিয়নাথ ভাবল, ঈর্ষা মানুষকে ছোট করে দেয়, আলাদা করে দেয়। এই চিন্তা কিছুটা বিপর্যস্ত করে দিল তাকে।

কয়েকদিন পরে একদিন বিকেলে তুমুল বৃষ্টি নামল। শহর-ভাসা বৃষ্টি; জল পড়তে লাগল প্রিয়নাথদের ছাদ চুঁইয়ে। বৃষ্টি থেমে যাবার পরও বন্ধ হলো না জল পড়া। ঘরদোর বাঁচানোর জন্যে বালতি আর বাটি নিয়ে জলের নিচে দাঁড়াল শ্যামা আর ভুনি।

শ্যামা বলল, 'আর দিন দুয়েক এই অবস্থা চললে আমরা ছাদ চাপা পড়ে মরব।'

'তা ঠিক।' প্রিয়নাথ বলল, 'মৃত্যুই দয়া। আজকাল মনে হয় শুধু মৃত্যুই পারে আমাদের বাঁচাতে।'

কথাগুলোয় অর্থ ছিল। প্রিয়নাথের দিশেহারা মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত মুখে শ্যামা বলল, 'কী যে বলো! সারাক্ষণ অমঙ্গলের চিন্তা!'

এই সময় হঠাৎ সজোরে ধাক্কা পড়ল দরজায়।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলল প্রিয়নাথ এবং শূন্য চোখে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করল, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বড়ো মানুষ—হ-বাবু। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যেতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'শ্যামা, ভুনি, দেখে যাও—'

'যা বৃষ্টি! তেমনি কাদা!' প্রিয়নাথ সরে দাঁড়াতেই চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন হ-বাবু, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তা, তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

'আছে—'

পুরোনো সুজনি পাতা চৌকির দিকে তাঁকে নিয়ে যেতে যেতে প্রিয়নাথ লক্ষ করল, হ বাবুর কর্দমাক্ত জুতোর দাগ শ্যামার হাতে নিকানো মেঝেয় ছাপ ফেলে যাচ্ছে পরিষ্কার। এতো কাদা কোত্থেকে এলো ভাবতে না ভাবতে শ্যামা ও ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দাঁড়াল।

'ইস, ভুল হয়ে গেল তো! জুতোটা বাইরে খুলে রেখে এলেই পারতাম!'

'না, ও কিছু নয়—,' তাঁর পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে বলল প্রিয়নাথ, 'সামান্য কাদা। মুছলেই উঠে যাবে। আপনি আরাম করে বসুন—'

'বসবার সময় কোথায়! গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এখুনি চলে যাবো হে। নেহাত ছেলেমেয়েদের নাম করে বলেছিলে—'

'তবু, একটু বসুন!'

প্রিয়নাথের ইশারায় ভুনি, টাকু এসে প্রণাম করল হ-বাবুকে।

'মঙ্গল হোক।' আলগোছে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে হ-বাবু তাকালেন ছাদের দিকে, ঘরের আশেপাশে। বললেন, 'এটা তো শুনেছিলাম বড়লোকের পাড়া। এরকম বাড়িও আছে নাকি!'

প্রিয়নাথ বলল, 'পুরোনো ভাড়াটে বলেই টিকে গেছি কোনোরকমে-'

বলতে বলতে চোখ পড়ল শ্যামার দিকে। হাত নেড়ে ডাকল শ্যামা। কাছে পৌঁছুতে বলল, 'কী বিশ্রী কাদা হয়ে গেল মেঝেটা! মুছে দেবো?'

'না, না। উনি বিব্রত হবেন। পরে করলেই চলবে। তুমি বরং একটু চা-টা করো।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শ্যামা বলল, 'তোমাকে বলেছিলাম না! দরজার বাইরেটা দ্যাখো। কত লোক!'

শ্যামার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে তাকাল প্রিয়নাথ এবং লক্ষ করল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন পাড়ারই কয়েকজন; অদ্ভুত দৃষ্টি তাঁদের চোখে—কখনো হ-বাবুকে দেখছেন, কখনো মেঝের ওপর তাঁর জুতোর দাগের দিকে। স্বাভাবিক নয় বলেই দৃশ্যটা বিমূঢ় করে দিল প্রিয়নাথকে। এঁদের কেউ কেউ তাঁদের বাড়িতে উপলক্ষ হলে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন দরজার বাইরে থেকে—ভিতরে ঢোকেননি; সে ঠিক বুঝতে পারল না, আজ ওঁদের ভিতরে ডাকবে কি না। তারপর ভাবল, এই বড়ো মানুষটির আবির্ভাবের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না তারা, সেইজন্যে আয়োজনও রাখেনি কোনো। এখন ডাকলে বসতে দেবে কোথায়! তখন হ-বাবুর দিকে তাকিয়ে ভাবল, দারিদ্র্যের সংসারে এই মানুষটির আবির্ভাবের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল কি না! নিজের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে সে ছুটে গেল হ-বাবুর দিকে।

হ-বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হঠাৎ।

'এরা কারা, প্রিয়নাথ?'

'পাড়া-প্রতিবেশী। আমাদের প্রিয়জন, আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

'এই ভয়ই পাচ্ছিলাম। ভিড়, যেখানে যাই সেখানেই ভিড়! লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের কোনো পজিটিভ কনট্রিবিউসন নেই। এরা শুধুই ভিড়!'

'দরজাটা বন্ধ করে দেবো?'

'না, তাহলে লোকের কৌতূহল বাড়বে। তোমার এখানে আসা হলো—এবার চলি—। কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হ-বাবু। তখনো কোনো আপ্যায়ন করে উঠতে পারেনি শ্যামা। তাঁর চলে যাওয়ার শব্দে ছুটে এসে বলল, 'এ কেমন আসা! এর চেয়ে—'

'হ্যাঁ, না এলেই ভালো হতো।' কিছু বা বিরক্তি ও হতাশায় অদ্ভুত শোনালো প্রিয়নাথের গলা, 'ওঁকে ধরে রাখা কি আমাদের সাধ্যে কুলোয়! যাক্‌গে, মেঝেটা কাদা হয়ে গেছে একেবারে। মুছে নাও।'

দরজার বাইরে তখনো কৌতূহলী কয়েকজন দাঁড়িয়ে। ওরা দেখল, একই সঙ্গে চোখের জল ও মেঝের কাদা মুছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে শ্যামা। কারুর মুখেই কথা ফুটল না কোনো।

তখনই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। বিব্রত, অন্যমনস্ক প্রিয়নাথকে সম্বোধন করে শ্যামা বলল, 'শুনছ, এ কেমন কাদা! এতো ঘষছি, কিছুই তো উঠছে না!'

প্রিয়নাথ বলল, 'কাদা কাদাই। ঠিক করে ঘষো, উঠে যাবে।'

'ঘষছি তো! আর কতো ঘষব!' বিরক্ত গলায় বলল শ্যামা, 'কী যে ছাই বড়ো মানুষ! লাভের মধ্যে শুধু ধরদোর নোংরা!'

প্রিয়নাথ চুপ করে থাকল।

কিন্তু, হাজার ঘষা ও ধোয়ামোছা সত্ত্বেও উঠল না দাগগুলি। ন্যাতা ঘষে না, ঝাঁটা ঘষে না, ঝামা ঘষেও না। প্রিয়নাথের গোটা সংসার তখন সেই দাগগুলির ওপর ঝুঁকে এলো এবং লক্ষ করল, দাগগুলি দেখবার জন্যে আরও অনেকে এসে জড়ো হয়েছে তাদের পিছনে। তাদের চোখে কৌতুহল এবং বিস্ময় ছাড়াও আরও কিছু ছিল। ব্যাপারটা

ঘটনা হতে দেরি হলো না। ক্রমশ আরও অনেকে এসে জড়ো হতে লাগল প্রিয়নাথের দরজায়। প্রতিবেশীদের অনেকেই অনেকরকম পরামর্শ দিল এবং দাগগুলি মুছে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুতেই কিছু না হওয়ায় সকলেই ধরে নিল ব্যাপারটা মোটেই মঙ্গলসূচক নয়।

সে যাই হোক, অদ্ভুত এবং অলৌকিক এই ঘটনার পর একটু অন্যরকম হয়ে গেল প্রিয়নাথদের জীবন। তারপর ক্রমশ অন্যরকম হতে লাগল। পাড়ার কারো বাড়িতে কোনো উৎসব, অনুষ্ঠান হলে কিংবা কোনো বড়ো মানুষের আবির্ভাব ঘটলে আর কেউই ডাকত না তাদের। প্রিয়নাথ বা শ্যামা এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করলেও স্বভাববশত ভুনি, টাকু ও বিনি কোন বাড়িতে কী কী সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশিত হতে পারে এবং কী কী ঘটনা আলোচিত হতে পারে এই নিয়ে চাপা আলোচনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। বাড়ির দরজায় ঘা পড়লেই তারা ধরে নিত, বড়ো মানুষের পায়ের দাগ দেখবার জন্যে কেউ না কেউ এসেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াত তারা। দর্শনার্থীরা চলে গেলে আবার ছিটকিনি তুলে দিত দরজায়। নিঃশব্দে।

একদিন দরজা খুলল না। তখন পুলিশ এলো। এবং দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখল, বড়ো মানুষের পায়ের দাগগুলিকে সামনে রেখে পর পর শুয়ে আছে প্রিয়নাথের পরিবারের শীর্ণ, কঙ্কালসার পাঁচটি মানুষ। কেউই জানতে চাইল না কেন এমন হলো।

তবে, অনেকেই বলল, কোনো বড়ো মানুষের আবির্ভাবের পর অনেক সময়েই এমন হয়।

লী ভ ট্রা ভে ল

অফিসে কাজ করতে করতে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল প্রফুল্ল বিশ্বাসের। অফিসের গাড়িতেই ধরাধরি করে তুলে পৌঁছে দেওয়া হয় হাসপাতালে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ ছিল। তিনদিন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, একমাস হাসপাতালে এবং আরও একমাস বাড়িতে কাটিয়ে, আধখানা অবস্থায় অফিসে জয়েন করে সে ম্যানেজমেন্টের কাছে অ্যাপীল করেছিল, চিকিৎসা বাবদ এই দু' মাসে তার খরচ হয়েছে সাত হাজার টাকা—এই টাকাটা তাকে সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করা হলে খুবই উপকার হবে। তেত্রিশ বছর একনাগাড়ে এই অফিসের সেবা করার পর এইটুকু সুবিধা কি সে আশা করতে পারে না?

অ্যাপীল করার পর পার্সোনেল ম্যানেজার রঘুবীর দত্ত ডেকে পাঠাল তাকে এবং বলল, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু, জানেনই তো, আপনার গ্রেডে মেডিকেল অ্যালাউন্স ফিক্সড্, বছরে বারো শো টাকা। অসুখের আগেই আপনি তা ড্র করে নিয়েছিলেন —'

তারপর প্রফুল্ল বিশ্বাস চুপ করে আছে দেখে বলল, 'লোন নিন না?'

'লোন নিলে শোধ করার প্রশ্ন ওঠে। গত বছর বড়ো মেয়ের বিয়ের সময় প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে বারো হাজার নিয়েছি—।' বলতে বলতেই কেমন অন্যরকম হয়ে গেল প্রফুল্ল। গলা কাঁপিয়ে বলল, 'যাদের লিমিট বারো শো টাকা তাদের সাত হাজারের অসুখ হয় কেন স্যার! এর চেয়ে মরে গেলেই ভালো হতো।'

রঘুবীর দত্ত পুরোনো লোক, কম করেও কুড়ি বছর তাকে এই অফিসে দেখছে প্রফুল্ল। তার মধ্যে এই পজিশনেই বছর বারো। মুখে মিষ্টি হ'লও গলে না সহজে। ইউনিয়ন ঠেকায় কড়া হাতে। বলল, 'ইমো-

শনাল হলে চলবে কী করে। মরা বাঁচা সবই ভগবানের হাতে। অফিসকে একটা নিয়ম মেনে চলতে হবে তো? তেত্রিশ বছর কাজ করেছে এই অফিসে এমন এমপ্লয়ির সংখ্যা তিনশোরও বেশি। আপনাকে দিলে একটা প্রিসিডেণ্ট ক্রিয়েটেড হবে, তারাও চাইতে শুরু করবে।'

প্রফুল্ল বুঝতে পারল কথাটা ঠিক; সুতরাং চুপ করে গেল। এমনও ভাবল, যুক্তি দিয়ে যখন অ্যাপীলটাকে দাঁড় করানো যাচ্ছে না, তখন তার উঠে যাওয়াই ভালো। পর মুহূর্তেই ভাবল, একবার উঠে যাওয়া মানেই তো অ্যাপীল তুলে নেওয়া। সাত হাজারের ভারে এখনই টিপ-টিপ করছে বুক—হয়তো আবার একটা স্ট্রোক হবে। তখন দত্তর দিকে ঝুঁকে পড়ে মরীয়া হয়ে বলল, 'আপনি একটু ফেভার করতে পারেন না স্যার?'

'আমার ফেভারে তো কাজ হবে না। রুল ইজ রুল।' থেমে গিয়ে অ্যাপীলটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে দত্ত বলল, 'ম্যানেজমেণ্ট তাকেই ফেভার করবে যে রিটার্ন দেয়, যাকে দিয়ে কাজ হবে। আপনার তো তিপ্পান্ন হয়ে গেল, আর মোটে সাত বছর। তারপর এই অসুখটা! বরং যাতে আরো সাতটা বছর এফিসিয়েণ্ট থাকতে পারেন—।'

সাত হাজারের দুর্ভাবনা থেকে হঠাৎই অ্যাপীল করার কথাটা মাথায় এসেছিল, অতশত ভেবে দেখেনি। অ্যাপীল করার পর মনে হয়েছিল ব্যাপারটা সঙ্গত। একটা জোরও পেয়ে গিয়েছিল মনে। রঘুবীর দত্তর শেষ কথাগুলো শুনে ঘামতে শুরু করল প্রফুল্ল।

'এখন যান।' দত্ত বলল, 'কথা বলে দেখি কী করতে পারি। তবে, কমিট করছি না কিছু—'

ডিপার্টমেণ্টে ফিরে নিজের চেয়ারে বসতে বসতেই শুরু হলো লোড-শেডিং। এরকম প্রায় রোজই হচ্ছে; একবার আলো পাখা বন্ধ হলে আড়াই তিন ঘণ্টার আগে আর চালু হয় না। ভ্যাপসা গরম আর প্রায়ান্ধকারে কে আর কাজ নিয়ে বসে থাকে! প্রফুল্ল দেখল একে একে চলে যাচ্ছে অনেকেই; আধ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল ডিপার্টমেণ্টের

পঁচাত্তর ভাগ। তখন বেয়ারা শচীনকে ডেকে বলল, 'ক্রেডিটরস্ লেজারটা কোথায়? দাও দেখি।'

'এখন কাজ করবেন নাকি?'

'করব না কেন!'

শচীন বলল, 'এই গরমে কাজ করলে আবার ব্লাডপ্রেসার বাড়বে, তারপর—'

'হার্ট অ্যাটাক হবে তো?' ফুল শার্টের হাতায় কপাল মুছে প্রফুল্ল বলল, 'বেঁচে না ফিরলে অফিসেই মরা হতো। এফিসিয়েন্সি নির্ভর করে লয়ালটির ওপর। তেত্রিশ বছর তাই করেছি—'

'লয়ালটি আপনি দেখান।' লেজার নিয়ে ফিরে এসে শচীন বলল, 'অফিস ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি এবার যাবো—'

কথাটা কানে তুলল না প্রফুল্ল। লেজারটা নিজের দিকে টানতে টানতে বলল, 'পার্সোনেল ম্যানেজারকে বল না ডিপার্টমেণ্টটা ঘুরে যাক একবার।'

হার্ট অ্যাটাকের পর দৃষ্টিশক্তিও আচ্ছন্ন হয়েছে সম্ভবত। প্রায় অদেখা আলোয় ক্রেডিটরস লেজারের এনট্রিগুলোর ওপর ঝুঁকে এলো প্রফুল্ল। ভাবল, বয়সটা অ্যাকুরেটলিই বলেছে দত্ত। ডাকবার আগে নিশ্চয়ই রেকর্ড দেখে নিয়েছিল। ভাবতে ভাবতেই জোরে নিঃশ্বাস নিল এবং ছেড়ে দিল।

তিপ্পান্ন পেরিয়ে যে দুটো ব্যাপারকে ভীষণভাবে ভয় করতে শিখেছে প্রফুল্ল বিশ্বাস, তার একটি চাকরি যাওয়া; দ্বিতীয়টি মৃত্যু। যে-লোককে মৃত্যুভয় পেয়ে বসে, অন্যান্য সব ভয়ই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবার কথা। তা সত্ত্বেও যে চাকরি যাওয়ার ভয়টাকে সে মৃত্যুরও আগে স্থান দিয়েছে তার কারণও সোজা। প্রফুল্ল জানে হঠাৎ কোনো কারণে মৃত্যু হলে সে মারাই যাবে এবং এখনো অগোছালো তার সংসারে নেমে আসবে অভাবিত বিপর্যয়; কিন্তু তার, অর্থাৎ মৃত লোকটির, দায়িত্ব থাকবে না কোনো। কিন্তু, হঠাৎ কোনো কারণে চাকরি গেলে মৃত্যুজনিত বিপর্যয়

তো থাকবেই, উপরন্তু দায়িত্বও নিতে হবে তাকে। পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা ভয়টা বাড়িয়ে দিল। গত দু' বছর কোম্পানীর ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে, নতুন লোক নেওয়া বন্ধ। যদি কোনো কারণে ব্যবসার অবস্থা আরো খারাপ হয় এবং ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কাকে রাখা দরকার কাকে নয় এ প্রশ্নও উঠবে। হার্টের অসুখ এমনিতেই আধখানা করে দিয়েছে তাকে; সারাক্ষণই মনে হয় তার অজ্ঞাতে শরীরের ভিতর থেকে ভারী একটা কিছু খুবলে বের করে নেওয়া হয়েছে। হয়তো এফিসিয়েন্সি, কিংবা মনের জোর; হয়তো বেঁচে থাকার অধিকার। প্রফুল্ল ঠিক জানে না। এই বয়স পর্যন্ত বড়ো মেয়ে ডলির বিয়ে দেওয়া ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারেনি। বড়ো ছেলে সুপ্রভাত গত বছর এম-এ পাশ করে এখনো বেকার। মেজ মেয়ে মলি এবার স্কুল-ফাইনাল দিল। ছোট ছেলে সুব্রত ক্লাস নাইনে। এই অবস্থায় মরা যদি বা যায়, চাকরি হারানো যায় না। আর থাকে স্ত্রী লীলা; লক্ষ করে দেখেছে তার অসুখটার পর শরীরে টান না পড়লেও চুলে অল্পসল্প পাক ধরতে শুরু করেছে লীলার। মাঝে একদিন রাতে গা-ঘেঁষে এসেছিল। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রফুল্ল বলেছিল, 'ট্রেন ছাড়ার আগে ওয়ার্নিং বেল পড়ে। তার মানে ছাড়ছেই। এই অসুখটাও তেমনি—'

'কী সব বলছ!' লীলা বলেছিল, 'জীবন কি আর ট্রেনের নিয়মে চলে! একটা ফাঁড়া কেটে যাবার পর আয়ু বেড়ে যায়, লাইফ নতুন করে শুরু হয়—'

জবাব না দিয়ে দুর্বলতা চিনতে চিনতে পাশ ফিরেছিল প্রফুল্ল।

ভয় এবং ভাবনা প্রফুল্লকে এমনই কব্জা করে ফেলল যে মেডিক্যাল এক্সপেণ্ডিচার বাবদ সাত হাজার টাকার কথাটা পার্সোনেল ম্যানেজারকে আবার করে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল না। বরং যতো দিন যেতে লাগল ততোই তার মনে হতে লাগল, সাত হাজারের চেয়ে অনেক বেশি দামী চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখা এবং কোনোরকমে আরও সাতটি বছর পার

করে দেওয়া। কে জানে, নিয়মকানুন জানা সত্ত্বেও এই উটকো অ্যাপীলটা করা ঠিক হয়েছিল কিনা! এসব ব্যাপারে অনেক সময়েই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। এই দুর্ভাবনায় নতুন করে লাইফ শুরু করল প্রফুল্ল।

২

একদিন বিকেলে বঘুবীর দত্ত ডেকে পাঠাল। সেদিনও লোডশেডিং, ডিপার্টমেন্ট প্রায় ফাঁকা। দত্তর বেয়ারা চাণক্য ডিপার্টমেন্টের মাঝামাঝি এসে ফিরে যাচ্ছিল, কী মনে করে এগিয়ে এসে বলল, 'কী ব্যাপার বিশ্বাসবাবু! বাড়ি না গিয়ে এই অন্ধকারে বসে আছেন!'

একটু আগেই ঘাড়ের কাছে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে একটা অ্যাডালফিন গিলেছে প্রফুল্ল! চমকে বলল, 'কে বলেছে আমি বাড়ি চলে যাই!'

'কেউ বলেনি। অন্ধকার দেখেই চলে যাচ্ছিলাম—' চাণক্য বলল, 'যান, পার্সোনেল ম্যানেজার খোঁজ করছেন।'

'ও।' মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল প্রফুল্লর। তাড়াহুড়োয় জলের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বলো আসছি।'

ঘোরলাগা মাথায় চারপাশটা দেখে নিল প্রফুল্ল। না, এদিকটায় কেউ নেই। ডিপার্টমেন্টের এক কোণে জানালা ঘেঁষে চার পাঁচজন ফুটবল ম্যাচের রীলে শুনছে। আলো, পাখা চললে ওভারটাইম শুরু করবে। আলো পাখা থাকুক না-থাকুক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শশধর চক্রবর্তী ছ'টা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত থাকেই; 'খানিক আগে 'ঘুরে আসছি' বলে সেও বেরিয়ে গেছে। তার মানে চাণক্যর আসা এবং চলে যাওয়াটা কেউই লক্ষ করেনি। এমন উদ্বেগের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ করল প্রফুল্ল এবং নিশ্চিন্ত হলো যেন এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াটা খুবই জরুরী। তারপর পার্সোনেল ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে ভাবল, অ্যাপীল যে কার্যকর হবে না এটা সে জানতই। অ্যাপীল করার সময়

কাউকে জানিয়ে করেনি—প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটাও কারুর না জানাই ভালো। এসব কথা পাঁচ কান হয়ে ম্যানেজমেন্টের কানে পৌঁছুতে দেরি হয় না। দোষের দায় তাকেই বহন করতে হবে।

'স্যার ?'

'বসুন।' বেশ আগ্রহের সঙ্গে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল রঘুবীর দত্ত। বলল, 'সেদিন মরে যাওয়ার কথা বলছিলেন না! আরে মশাই, বেঁচে না ফিরলে সমস্ত থ্রীলই মিস করতেন।'

প্রফুল্ল ভেবেই এসেছিল কোনো বাড়তি কথা বলবে না। সুতরাং চুপ করে থাকল।

'ভগবানে বিশ্বাস করেন না তো! এই দেখুন, আপনার কেস্‌টা স্পীড আপ করতে গিয়ে শাপে বর হয়ে গেল।' বলতে বলতে টেবিলের ওপর থেকে একটা মুখ বন্ধ করা খাম তুলে বাড়িয়ে দিল রঘু দত্ত, 'নিন। প্রোমোশনের চিঠি। অফিসারস্ গ্রেডে তুলে দেওয়া হলো আপনাকে। এখন যতো ইচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হোক, কেউ আর বিল আটকাচ্ছে না আপনার। তবে বোনাসটা আর পাবেন না, তার বদলে লীভ ট্রাভেল ফেসিলিটিজ—'

রঘুবীর দত্তর মুখ আর মাথাটা বড়ো হতে হতে গোটা দেওয়ালটা আড়াল হয়ে যাবার পর প্রফুল্ল উচ্চারণ করল, 'স্যার!'

'স্যার কী মশাই! হাতটা বাড়ান, হ্যাণ্ডশেক করুন! তারপর চিঠিটা নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যান—'

বাইরে এসে তখনো অবিশ্বাসে ভারাক্রান্ত প্রফুল্ল বিশ্বাস খাম থেকে চিঠিটা বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। তিন লাইনের ছোট চিঠি। ম্যানেজমেন্ট খুশী হয়ে তাকে প্রোমোট করেছে অফিসার গ্রেডে। এখন থেকে এই গ্রেডের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সে পাবে। এই প্রোমোশন তিন মাস আগে থেকেই কার্যকর হবে। বয়ানটি ঠিক ঠিক মাথায় রাখার চেষ্টা করতে করতে, চিঠিটা খামে ভরে, খামটা কপালে ঠেকিয়ে বুক পকেটে রাখল প্রফুল্ল। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল ডিপার্টমেন্টের দিকে।

হঠাৎ কখন জ্বলে উঠেছে আলো—সম্ভবত পার্সোনেল ম্যানেজারের ঘরেই সে ফ্যান চলতে দেখেছিল। যারা বাঁলে শুনছিল তারা এখন ফিরে এসেছে যে যার নিজের জায়গায়। অধিকাংশই চলে যাওয়ায় ডিপার্টমেন্ট জুড়ে এখন যতো লোক তার চেয়ে ফ্যানের সংখ্যা বেশি। সবগুলিই ঘুরছে—মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্টের লোক এসে সুইচ অফ না করা পর্যন্ত ঘুরেই চলবে। প্রফুল্ল দেখল, রেগুলেটারটা পুরো স্পীডে চালিয়ে নিজের জায়গায় গুছিয়ে বসেছে শশধর চক্রবর্তী। বাড়তি হাওয়ার অনেকটাই তার বুকে এসে লাগল।

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা নিজের মনে তদন্ত করে নিল প্রফুল্ল। এখন তার যতোবার ইচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, অসুখ-বিসুখের সমস্ত খরচই কোম্পানী বহন করবে। তিন মাস আগে থেকে প্রোমোশন কার্যকর করার অর্থ আগের অ্যাটাক বাবদ সাত হাজার টাকাটা পেয়ে যাবে—এটার জন্যেই সে অ্যাপীল করেছিল। তা না হয় হলো; কিন্তু প্রোমোশন পেয়ে লাভ হলো কী! তেত্রিশ বছরের চাকরিতে এর আগে একবারই মাত্র প্রোমোশন হয়েছিল তার—পনেরো বছর আগে, যখন কেরানী থেকে সুপারভাইজার করা হয় তাকে। ক্লারিকাল গ্রেডে ম্যাক্সিমাম টাচ করায় তার আগে গ্রেড ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ ছিল এক বছর; পরের গ্রেডে না তুললে আর কোনোদিনই ইনক্রিমেণ্ট হতো না। ওটাকে প্রোমোশন বলা চলে না। পনেরো বছর সুপারভাইজারি গ্রেডে কাজ করার পর গ্রেড ইনক্রিমেণ্ট হতে হতে এখন মাইনে যে-জায়গায় এসে পৌঁচেছে, অফিসার গ্রেড শুরু হয় তার বেশ কিছু পিছন থেকে। রঘুবীর দত্ত মেডিক্যাল বেনিফিট, লীভ ট্রাভেল ফেসিলিটিজের কথা বলল, কিন্তু মাইনে বাড়ছে কিনা বলল না। তার মানে বাড়বে না; এই মাইনেতেই অফিসার গ্রেডে অ্যাডজাস্ট করে দেবে। এদিকে বোনাসও বন্ধ হলো! এই বাবদ তার বছরে ক্ষতি হবে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তার মানে হবে দরে দু' বছরের মধ্যেই এখনকার সাত হাজার টাকাটা পুষিয়ে নেবে কোম্পানী। সত্যিকারের বেনিফিট

পেতে হলে এখন তার কিংবা তার পরিবারের যে-কারও ঘন ঘন বড়ো ধরনের অসুখ হতে হবে—হার্ট-অ্যাটাক বা ওইরকম কিছু, যার ফলে মৃত্যুও হতে পারে! এটা কী ধরনের ব্যবস্থা হলো! ইত্যাদি ভাবনায় প্রোমোশনের যাবতীয় হিসাব মাথার মধ্যে গোল পাকিয়ে গেল প্রফুল্লর। পার্সোনেল ম্যানেজারের ঘর থেকে চিঠিটা নিয়ে বেরুনোর সময় আনন্দ-জনিত যে-সম্ভাবনায় সে কাঁপছিল, তার অনেকটাই গেল উবে। ভাবনার মধ্যেই সে পৌঁছে গেল একটা বিক্ষোভে।

প্রোমোশনের ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না ভেবেও এখনকার অশান্তিটা এড়াতে পারল না প্রফুল্ল বিশ্বাস। দূর থেকে দেখল ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে সামনে রাখা কাগজে টিক্ মেরে যাচ্ছে শশধর চক্রবর্তী। এমনই তন্ময় যে মনে হয় না প্রফুল্লর ফিরে আসাটা লক্ষ করেছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণে বয়সের তুলনায় ভারিক্কি দেখায় কিছুটা। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর অফিসের যে তিনজনকে সে প্রথম দেখতে পায় শশধর তাদের একজন। তখন থেকেই প্রফুল্লর ধারণা হয় লোকটি ভালো—যদিও একই অফিসে একই ডিপার্টমেন্টে একসঙ্গে দশ বছর কাজ করার পরও একটা আড়াল রেখে চলে শশধর। কোয়ালিফায়েড তার ওপর ম্যানেজার, হয়তো সেই কারণেই। তবে শশধরকেই বলা যায় ব্যাপারটা।

'শশধর, কেমন আছো?'

'কী ব্যাপার!' হঠাৎ প্রফুল্লকে সামনে দেখে অবাক হলো শশধর, এসে দেখতে পেলাম না, ভাবলাম চলে গেছেন—'

'এখানেই ছিলাম। তাছাড়া—', শশধর বিরক্ত হচ্ছে না দেখে চেয়ার টেনে বসে পড়ল প্রফুল্ল, 'জানোই তো, অসুস্থ শরীরে ট্রামবাসের জন্যে ছোটাছুটি করা কী ব্যাপার। এখন গুমটিতে গিয়ে বাসে বসে থাকি, যখন ছাড়ে ছাড়বে—'

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, একটা খবর নেওয়ার ছিল—।' সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে একবার

আশেপাশে তাকিয়ে নিল প্রফুল্ল। তারপর বলল, 'অফিসার গ্রেডে প্রোমোশন পেলে কী কী বেনিফিট পাওয়া যায় বলতে পারো?'

'কে পেয়েছে?'

'না, ইয়ে—', ইতস্তত করে পকেট থেকে রঘুবীর দত্তর চিঠিটা বের করে শশধর চক্রবর্তীর দিকে বাড়িয়ে ধরল প্রফুল্ল, 'পার্সোনেল ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়েছিল একটু আগে—হাতেই দিল। চিঠিতে তো কিছু লেখা নেই!'

প্রফুল্ল কথা শেষ করার আগেই তিন লাইনের চিঠিটা পড়ে ফেরত দিল শশধর।

'এ তো সুখবর! কনগ্র্যাচুলেসন্। আপনাকে ওয়ারিড দেখাচ্ছে কেন!'

শশধরকে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসতে দেখে প্রফুল্লও হাসল এবং বলল, 'ঠিক ওয়ারিড নয়, চিন্তিত।'

'চিন্তিত!'

'তেত্রিশ বছর চাকরিই করেছি, লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখিনি। এই হার্টের অসুখটাই সব গোলমাল করে দিল। এখন কিছু পেলে ঠি কতোটা পেলাম জানতে ইচ্ছে করে—'

শশধর চুপ করে থাকল।

প্রফুল্ল বলল, 'বুঝতেই পারো। বড়ো ফ্যামিলি, রোজগেরে লে একা।'

মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল শশধর। খানিক কিছু ভে নিয়ে বলল, 'আপনার কেসটা আমি আগেই জানি; মিস্টার দত্ত ডিসক করেছিলেন আমার সঙ্গে। অবশ্য, চিঠি পেয়ে গেছেন জানতাম না—'

'এখন তো জানলে!'

'হ্যাঁ। তবে মাইনেকড়ি খুব একটা বাড়বে বলে আশা করবেন ন বেনিফিট্স্ বাড়বে—আনলিমিটেড মেডিক্যাল, লীভ ট্রাভেল, এই আর কি। প্রেসটিজও বাড়বে। এখন তো আপনি অফিসার—পা

জনকে বলতে পারবেন—'

'তাতে আমার লাভ কী! আনলিমিটেড মেডিক্যাল বেনিফিট পেতে হলে অসুখও হতে হবে—।' হঠাৎ রেগে গেল প্রফুল্ল, 'ম্যানেজ-মেণ্ট কি আমাকে মেরে ফেলতে চায় নাকি?'

'ওভাবে ভাবছেন কেন! ওটা একটা প্রোটেকসান্। যে-কোনো অসুখে চিকিৎসার জন্যে ভাবনা নেই জানা থাকলে দুশ্চিন্তা কমে যায়, অসুখও কম হয়।'

'এটা আগে পেলে অ্যাটাকটা হতো না। মেয়ের বিয়ের পর থেকেই শরীরটা ভাঙতে শুরু করে—'

'যাক গে।' আলোচনাটা শেষ করতে চাইল শশধর, 'ওই লীভ ট্রাভেল অ্যালাউন্সটাও কম নয়। নিয়মকানুন পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্টই জানিয়ে দেবে। প্রোমোশন হলো, যান, এখন কিছুদিন মিসেস আর ফ্যামিলিকে নিয়ে ঘুরে আসুন কোথাও। ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন ফেয়ার দেবে—এনিহোয়্যার ইন ইণ্ডিয়া—যাতায়াতের খরচ। ভেবে দেখুন, এই মাগ্‌গী গণ্ডার দিনে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ছুটি কাটানো—এটা কিন্তু কম বেনিফিট নয়!'

ব্যাপারটা পুরোপুরি মাথায় ঢুকতে যতোটা সময় লাগে তার আগেই মাথা নাড়ল প্রফুল্ল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'হ্যাঁ, এটা একটা সুবিধে বটে—'

৩

বড়ো ছেলে সুপ্রভাত পাড়ার রকে আড্ডা দিচ্ছিল। তাকে ডেকে পাঠিয়ে লীলা বলল, 'যা, মুরগীর মাংস আর মিষ্টি নিয়ে আয়। কম চিনির সন্দেশ আনবি।'

অসময়ে এরকম ফরমাশ শুনে ঘাবড়ে গেল সুপ্রভাত।

'হঠাৎ !'

'হঠাৎ না তো কি ! তোর বাবার প্রোমোশন হয়েছে। এই তো ফিরলেন উনি।'

মার হাত থেকে বাজারের থলি আর টাকা নিতে নিতে সুপ্রভাত বলল, 'প্রোমোশনের এফেক্ট কি একদিনই ? না রোজই এরকম হবে ?'

শোবার ঘরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেঞ্জি পরছিল প্রফুল্ল। ছেলের কথাটা কানে যেতে কিছু রাগ, কিছু বিরক্তি, কিছু অভিমান এবং কিছুটা আনন্দে বলল, 'ফাজলামিটা ভালোই শিখেছিস। বাপ মরে গেলে এই একদিনও হতো না।'

'আঃ, তুমি থামো তো !' লীলা বলল, 'আনন্দ তো ছেলেমেয়েরাই করে। যা, তুই যা—'

'আনন্দই বটে।' লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত প্রফুল্ল বেরিয়ে এল ঘর থেকে, লীলার মুখোমুখি। শোবার ঘর ও রান্নাঘরের মাঝখানে চৌকো বারান্দায় সাধারণ খাবার টেবিল ও গোটা তিনেক চেয়ার পাতা। ওই চেয়ারের একটিতে বসে সকালে অফিস যাবার আগে ভাত খায় প্রফুল্ল চা-জলখাবার খায় অফিস থেকে ফিরে। এখন সেই চেয়ারের একটিতে বসতে বসতে বলল, 'বি-এ, এম-এ পাশ করিনি। ওই বয়সে আমার চাকরি পাঁচ বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তখন বাপের হোটেল ছিল না, আনন্দও ছিল না—'

কিছু বলার আগে লীলা দেখে নিল সুপ্রভাত ঠিক বেরিয়ে গেল কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'একটা দিনও যদি গালমন্দ ছাড়ো ! এ নিয়ে সাতটা ইন্টারভিউ দিল। কোথাও কিছু না হলে ওর কী দোষ !'

'ওকে আর দোষ দিলাম কোথায় ! দোষ আমার কপালের। এ ভাবলে আনন্দ থাকে না।'

বাবা বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে চা বানাতে ঢুকেছিল মলি ওকে চায়ের কাপ হাতে এগিয়ে আসতে দেখে মুখের কথাটা চেপে গেল লীলা। প্রতিদিনের এই সব কথায় মেয়ের যে কান নেই তা নয়

ওপর-ওপর শান্ত, এমনিতে মগজ-পাকা। ক'দিন আগে স্কুল-ফেরত ঘোষদের মেজছেলের সঙ্গে রেস্টুরেণ্টে ঢুকেছিল। ব্যাপারটা দেখে ফেলে সুপ্রভাত, বাড়িতে এসে চোটপাট করে। পরের দিনই ফ্রক ছাড়িয়ে মেয়েকে শাড়ি ধরায় লীলা। ভয়টা কাটেনি। এরকম দৃশ্য দৈবাৎ প্রফুল্লর চোখে পড়লে আবার হার্ট-অ্যাটাক হবে। যেন সেই দৃশ্যটাই আড়াল করার জন্যে এমনভাবে তাকাল মলির দিকে যাতে সে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং পড়ায় বসে। ছোট, সুব্রত সুর করে কী যে পড়ে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে থামে, আবার সুর ধরে। গতবারের পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করার পর প্রোগ্রেস রিপোর্টে সই করেনি প্রফুল্ল, অফিসে গিয়েছিল না খেয়ে। কারণ এক হলেও তার ও প্রফুল্লর জ্বালার জায়গা দুটো আলাদা। এখন প্রফুল্লকে দেখতে দেখতে মাথার আচলটা একটু টেনে নিয়ে বলল, 'তোমার সময় আর ওদের সময়ের মধ্যে তফাত অনেক—'

প্রফুল্ল জবাব দিল না। কিছু ভাবছে, চোখদুটো মেঝের দিকে নামানো ; চায়ের কাপটা হাতে তুলে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। শরীরের ভিতর থেকে কিছু একটা খুবলে বের করে নেওয়ার ধারণাটা মিথ্যে নয়। শুধু যে শরীরই হালকা লাগে তা নয়, প্রায়ই অসম্ভব ফাঁকা লাগে মাথা-টাও। ওরই মধ্যে কখনো বিদ্যুৎ খেলে যায় চকিতে। এখনো মনে হলো, প্রোমোশন না নিয়ে ঐ অফিসেই ছেলেটার একটা হিল্লে করে দিলে হয়তো সত্যিই কিছুদিন আয়ু বেড়ে যেত তার। তা হবার নয়। এখন যা অবস্থা তাতে শ্মশানে মুখাগ্নির পাটকাঠি নিভে গেলেই শূন্য হাতে ফিরবে ছেলেটা। এই ভেবে, নিঃশ্বাস চেপে, ষাট পাওয়ারের বাল্‌বের বিষণ্ণ আলোয় লীলার সিঁথি'র দিকে তাকাল প্রফুল্ল।

আঁচল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছে মাথার কাপড়টা আবার যথাস্থানে সাজিয়ে নিল লীলা।

'হ্যাঁ গো, প্রোমোশনের পর এখন সবাই তোমাকে কী নামে ডাকবে?'

'নাম পাল্টায় নাকি!'

'অফিসার বলবে তো ?'

'ওই আর কি ?'

প্রফুল্ল খুশী না অখুশী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লীলা একটু পড়বার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'এতোদিন তো শার্টপ্যান্ট পরেই চলল। এবার কি টাই পরতে হবে ?'

'টাই !' কথাটা বুঝতে সময় লেগেছিল। বুঝে হেসে ফেলল প্রফুল্ল। বলল, 'ওসব সাহেবদের আমলে ছিল। তাছাড়া টাই পরার লোক আলাদা হয়ে জন্মায়—'

মাংস নিয়ে ফিরেছে সুপ্রভাত। তাড়াতাড়ি থলিটা নামিয়ে চলে যাচ্ছিল, প্রফুল্ল ডাকল।

সুপ্রভাত ঘুরে দাঁড়াল।

'আমাকে ডাকছ ?'

হ্যাঁ, তোকে না তো কাকে ?'

এটা নতুন ব্যাপার। যতো দিন যাচ্ছে বাপ-ছেলের মধ্যে দূরত্ব ততোই বেড়ে চলেছে যেন। লীলা জানে, অনুমান করতে পারে অন্তত, দু'জনেই একই অসুখে ভোগে—ভিতরের প্রতিক্রিয়া আলাদা হলেও সামনাসামনি একই অস্বস্তি আড়াল করে রাখে দু'জনকে। দু'জনেরই অনুযোগ অভিমান জমা হয় লীলার বুকে। কষ্ট বেশি হলে ওষুধ খায় হাঁপানির। রাতে শুতে যাবার আগে দুটো হোমিওপ্যাথি গুলি—পাড়ার ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বলেছিল, কলকাতার একতলা বাড়ির চাপা পরিবেশে একসঙ্গে অনেকদিন থাকতে থাকতে অনেকেরই হয় এরকম। আসল কারণটা বলা যাবে না, তাই এই কারণটা পেয়ে পাঁচ ছ'তলা বাড়ির ওপরের তলায় থাকার স্বস্তি অনুভব করেছিল লীলা। এই মুহূর্তে নিজে থেকেই ছেলেকে ডাকল শুনে ধরে নিল প্রোমোশন মন ভালো করে দিয়েছে প্রফুল্লর। সুপ্রভাত তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে নিজে উঠে দাঁড়াল লীলা। বলল, 'বোস না এখানে ! বাবার প্রোমোশনটা কী-রকম হলো শোন। আমি মাংসটা মলিকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি—'

সুপ্রভাত দাঁড়িয়েই থাকল।

দায়সারাভাবে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিল প্রফুল্ল।

'চাকরির বাজার যে খারাপ এটা সকলেই জানে। কাগজে পড়ি দেশে বেকারের সংখ্যা নাকি বেড়েই চলেছে। শিক্ষিত বেকারই নাকি কয়েক লক্ষ—'

লীলা ফিরে এল। তিনজনকে ধরে রেখা টানলে অসমান ত্রিভুজ। কোথাও ঠিকঠাক জোড়া না লাগায় ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে স্তব্ধতা।

প্রফুল্লই সেটা ভাঙার চেষ্টা করল।

'চেষ্টাটা চালিয়ে যাও। হতাশ হবার কিছু নেই।' থেমে, আরও একবার ছেলেকে দেখল প্রফুল্ল। বলল, 'তোমার মা প্রোমোশন বলতে একটা বিরাট কিছু বোঝে। তা নয়। অসুখের বিলটা মিটিয়ে দেবার জন্যে একটা দরখাস্ত করেছিলাম। এমনিতে হচ্ছিল না, তাই ওপরের গ্রেডে তুলে দিল। টাকাটা পাওয়া যাবে। এখন থেকে অসুখবিসুখের খরচাটাও পাওয়া যাবে।'

'ভালোই তো।'

দু শো গজ দূর থেকে ভেসে এলো সুপ্রভাতের গলা।

লীলা বলল, 'মাইনে বাড়বে না?'

'মনে তো হয় না। তাছাড়া—', বোনাস বন্ধের কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল প্রফুল্ল। লীলা ভাবতে পারে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুরগীর মাংস কেনার বিলাসিতা বাদ দিলেই হতো। বলল, 'তবে গোটা ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে যাবার সুবিধে আছে। লীভ ট্রাভেল ফেসিলিটিজ। শুনছি যাতায়াতের ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন ভাড়া দেবে। ব্যাপারটা মন্দ নয়। ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, কলকাতার বাইরে যে একটা ভারতবর্ষ আছে, সেটা জেনেছিলাম ভূগোলের বইয়ে। কতোদিন বাইরে যাইনি কোথাও! কুড়ি বছরেরও বেশি। তোর জন্মের পর একবার পুরী গিয়েছিলাম মনে আছে—'

প্রফুল্ল চুপ করতে লীলা বলল, 'কেন! একবার ভাগলপুর গিয়েছিলে না? তোমার ছোট শালার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে?'

মনে করার চেষ্টা করে প্রফুল্ল বলল, 'সেও তো অনেক বছর হবে। মলি হয়েছিল কি? দিন দুয়েকের জন্যে। ওটাকে বেড়ানো বলে না।'

'যাবে নাকি ছুকুর ওখানে? টাটানগর শুনেছি ভালো জায়গা। ছুকুও প্রায়ই লেখে। ভাড়া দিলে সকলে মিলে যাওয়া যেত!'

'তুমি যে কী বলো, মা!' সুপ্রভাত এবার খোলামেলা হলো, 'অফিসের টাকায় কেউ টাটানগরে বেড়াতে যায় না। যেতে হলে দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীর—'

'ঠিকই।' প্রফুল্ল বলল, 'গাঁটের পয়সা খরচ করে তো ওসব জায়গায় কোনোদিন যাওয়া যাবে না। যেতে হলে দূরে কোথাও—'

কথা শেষ না হতেই লোডশেডিং হলো। লীলা উঠে গেল লণ্ঠন জ্বালাতে। তখন প্রফুল্ল বলল, 'তোমরা তো আজকালকার ছেলে, অনেক খবর রাখো। মাথা খেলিয়ে বলো তো কোথায় যাওয়া যায়?'

মাংস রান্নার গন্ধে মেশে আর একরকমের সুগন্ধ। বেড়ানোর গল্পে আর আলোচনায় প্রফুল্ল বিশ্বাসের সংসার ক্রমশ পরিণত হয় ছোটোখাটো ট্যুরিস্ট অফিসে। রঙীন সৌন্দর্যে রম্য তার চারিদিক। কাশ্মীর ও দার্জিলিং থেকে নামগুলো ছড়িয়ে পড়ে শিলং, জয়পুর, সিমলা, উটি, জলদাপাড়া, নৈনিতাল এবং গোয়ায়।

লীলার ইচ্ছায় আজ অনেকদিন পরে গোটা সংসার খেতে বসেছে একসঙ্গে। প্রফুল্ল লক্ষ করল, লণ্ঠনের আলোয় আবছায়া মুখগুলিতে ফুটে উঠেছে ষড়যন্ত্রকারীর আভা। নাকি সমস্তই রূপের আদল, যার নাগাল কোনোদিনই খুঁজে পায়নি সে! প্রফুল্ল জানে না, বুঝতে পারে না, সবই কেমন অন্যরকম লাগে। মুরগীর হাড় চিবোতে গিয়ে বিষম খায় ছোট ছেলে সুব্রত, বলার কথাটি ছাড়তে চায় না তবু। কাশির দমক কেটে যাবার পর বলল, 'আমাদের ক্লাসের পবিত্র সব জায়গাগুলোতেই গেছে। এবার পুজোর ছুটিতে নাকি আন্দামান যাবে—'

এই সময় আলো জ্বলে উঠল এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই চুপ করে গেল।

প্রফুল্ল এতোক্ষণ বিশেষ কথা বলেনি। এক ধরনের বিষণ্ণতা ক্রমশ ছেয়ে ফেলছিল তাকে। উঠতে উঠতে বলল, 'দেখা যাক—'

শরীরের ভিতর থেকে কিছু একটু খুবলে বের করে নেওয়ার অনুভূতিটা মিথ্যে নয়—শোবার ঘরে এসে আলো নিবিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ার পর আবার সেটা অনুভব করল প্রফুল্ল। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও ঠিক আগের মতো গভীর নয়। ক্রমশ থেমে-আসা চারদিকের শব্দের ভিতর নিজেকে খুঁজতে গিয়ে অসম্ভব দুর্বল লাগল তার। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে জ্ঞান ফেরার পর যেরকম লেগেছিল। স্তব্ধতাকে এইসময় মৃত্যুর কাছাকাছি এনে ফেলা যায়। বেঁচে আছে এটা জানার জন্যে বিছানার চাদরটা দুই মুঠোয় চেপে ধরল সে।

দরজা বন্ধ করে লীলা উঠে এলো বিছানায়। হাত দিয়ে প্রফুল্লকে ছুঁয়ে বলল, 'কী হলো তোমার! হঠাৎ কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলে!'

প্রফুল্ল বলল, 'ভাবছি।'

'আবার কী ভাবনা তোমার!'

পাশ ফিরে স্ত্রীর মুখোমুখি হলো প্রফুল্ল। লীলার শরীর থেকে যতোটা পারে গন্ধ টেনে নিল নাকে।

'এতোকাল শুধু চাকরি করে গেলাম। আশা-আকাঙ্খাগুলোকে বস্তায় বন্দী করে ফেলে রেখেছিলাম একপাশে। বস্তা ফুটো করে আজ সেগুলো বেরিয়ে পড়ল!'

'কী বলছ এসব!'

'ভুল বলিনি। ছেলেমেয়েগুলোও সবাই আমার মতো হয়েছে। নখ নেই বলে হাত পা গুটিয়ে রাখে। শুনলে না কতো কেউ কত্তো জায়গায় গেছে! আমার ছেলেমেয়েরা শুধু প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছেড়ে যাওয়া দেখে—'

'তুমি যে কী পাগল!' উৎকণ্ঠার গলায় লীলা বলল, 'তুমি যেভাবে

ছেলেমেয়েদের দেখেছ, ক'জন বাবা তা পারে!'

দেখা মানে কি, শুধু পেটের ভাত পাছার কাপড় জোটানো! ছেলেমেয়েদের মনে বাপ সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। সেই ধারণাটা আমি ওদের দিতে পারিনি। আমারই দোষ!'

লীলা ঠিক বুঝতে পারে না প্রফুল্ল কী বলছে; আবেগের উৎসস্থলে একটা হাহাকার এসে তোলপাড় করে শুধু। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা না বুঝতে পারা থেকে প্রফুল্লর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'এতোদিন যখন এসব ভাবোনি, এখনো ভেবো না—'

প্রফুল্ল জবাব দিল না। টানাপোড়েনের জীবন থেকে পালাবার জায়গা বলতে লীলা—বছরের পর বছর লীলাই তার বেড়ানোর মহাদেশ। সপু, ডলি, মলি, সুবু—প্রতিটি জায়গার বৃত্তান্ত সেখানে, চাইলেই বেরিয়ে পড়া যায়। এখনো তাই; নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টায় চলে এল লীলার উত্তাপের আরও কাছাকাছি।

অন্ধকারে প্রফুল্লর মুখটা খোঁজার চেষ্টা করে সন্দেহের গলায় লীলা বলল, 'হ্যাঁ গো সত্যি বলো তো, শরীরে জোর পাচ্ছ তো?'

'দেখি—'

পাহাড়ের রাস্তা। গোটা সংসার মাথায় নিয়ে টালমাটাল পায়ে এগোচ্ছে প্রফুল্ল। টাল খেলেই খাদ। নিজের সাধ্যে যতোটা পারে ঠেকা দেবার জন্যে এগিয়ে এলো লীলা। গলার যেদিকটা ঘাম বেশি সেদিকটা পাখার দিকে ফেরাতে ফেরাতে বলল, 'তুমি হাসপাতালে যাওয়ার পর ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। আবার আনাতে হবে।'

৪

'অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন!' দিন পাঁচেক পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে ঘোরাঘুরি করার পর ডীলিং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সহদেব গুহ বলল, 'মাইনে

পেলেই বুঝতে পারবেন কী পেলেন না পেলেন। আমরা কি আপনার প্রাপ্য টাকা কমিয়ে দেবো!'

অনেকের মধ্যে বলা বলেই কথাগুলো ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। আশপাশের মুখগুলিতে চাপা হাসি লক্ষ করে অস্বস্তি বোধ করল প্রফুল্ল এবং আবারও ভাবল উঠে যায়। এই ক'দিনে অফিসের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তার প্রোমোশনটাকে কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি—ব্যাপারটা এমনই, যেন হয়েছে বেশ হয়েছে, না হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। ডিপার্টমেন্টের রমণী শীলের একই বয়স, প্রায় একই সঙ্গে ঢুকেছিল চাকরিতে। খবরটা কানে যেতে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'এতোদিন কাজকম্ম শিখেছি চাকরিতে উন্নতি করার জন্যে, হার্ট অ্যাটাক কী করে হয় শিখিনি। প্রফুল্লর কাছে শিখে নিতে হবে।'

শুনে অস্বস্তিতে ঘামতে শুরু করেছিল প্রফুল্ল। জবাব ছিল না বলেই জবাব দিতে পারেনি। এখনো তাই হলো। প্রফুল্ল ভাবল, সহদেবের কথায় উঠে গেলেই ব্যাপারটা পিছিয়ে যাবে। তাছাড়া মাইনে হতেও এখনো দেরি আছে বেশ কয়েক দিন—ইতিমধ্যে, সেদিন খবরটা পাবার পর থেকে, গোটা বাড়ি হাঁফসাচ্ছে লীভ ট্রাভেলের টাকায় বেড়াতে যাবার জন্যে। এর মধ্যে ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে গোয়া, কাশ্মীর আর দার্জিলিংয়ের ট্রাভেল গাইড যোগাড় করে এনেছে সুপ্রভাত—দিনে পঞ্চাশবার অ্যাটলাসের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোন জায়গাটা কোথায় খুঁজে বেড়ায় মলি আর সুব্রত। লীলা কিছু না বললেও ওর চোখমুখ চালচলন দেখে মনে হয় ধোঁয়া কেটে গেছে, এখন চারিদিকে সুবাতাস। সেদিন রাত্রের পর থেকে বিছানায় আসে গলায় বুকে পাউডার ছড়িয়ে। এই মুহূর্তে সহদেব গুহর সামনে বসে থাকতে থাকতে সেই গন্ধটা নাকে এসে লাগল প্রফুল্লর। দম টেনে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় অনুভব করল কন্ট্রোল নেই, নাকের ফুটো আর মুখের হাঁ দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে গলগল করে। সেই অবস্থাতেই সিদ্ধান্ত নিল। অনুনয়ের গলায় সহদেবকে বলল, 'মাইনের ব্যাপারটা না হয় পরে জানা যাবে। লীভ ট্রাভেলের

নিয়মটা কী ? শুনেছি ফর্ম ফীলাপ করে জমা দিতে হয় ?’

‘লীভ ট্রাভেল !’ সোজাসুজি প্রফুল্লর মুখের দিকে তাকাল সহদেব। খানিকটা সময় নিয়ে বলল, ‘ও, আপনি তো এখন অফিসার, লীভ ট্রাভেলে এনটাইটেল্‌ড্‌ হয়েছেন— ।’ বলতে বলতে থামল। তারপর বলল, ‘এক কাজ করুন, বিকেলে আসুন। লাস্ট ইয়ার পে-স্কেল রিভিসনের পর কী সব ওলটপালট হয়েছে। দেখে বলতে হবে।’

‘ঠিক আছে। বিকেলেই আসব।’

প্রফুল্ল উঠে পড়ল।

পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে নিজের ডিপার্টমেণ্টের দিকে এগোবার সময় দেখল পার্সোনেল ম্যানেজার রঘুবীর দত্ত আসছে। প্রোমোশনের চিঠি পাবার পর এই দেখা। আগে আগে এই রকম মুহূর্তে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যেত। এখন ভাবল, অফিসাররা কেরানী নয়, সুতরাং সে দাঁড়িয়ে পড়তে, এমনকি প্রয়োজনে কথাও বলতে পারে— রঘুবীর খুশী হবে। এই ভেবে সে কোমর থেকে ঝুলে পড়া ট্রাউজার্সটা টেনে যথাস্থানে আনবার চেষ্টা করল এবং সেই অবস্থাতেই লক্ষ করল, কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই অন্যদিকে তাকিয়ে তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে রঘুবীর। না-চেনার ধরনটা ইচ্ছাকৃত। আগে থেকেই অভ্যস্ত হওয়ায় বুকের সামান্য দোলা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না প্রফুল্লর। অফিসাররা ম্যানেজার নয়, তফাত থাকবেই।

এতোক্ষণ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তাতে ক্লান্তি বোধ করার কারণ নেই কোনো। তবু, কাজে ফিরে প্রফুল্ল অনুভব করল কেমন একটা গোলমেলে অভিজ্ঞতা দ্রুত জায়গা বদল করছে শরীরের মধ্যে—দপদপ করছে মাথার বাঁদিক ঘেঁষে নির্দিষ্ট একটি জায়গা, ভারী লাগছে চোখের পাতা, অতি-রিক্ত হাওয়ার জন্যে ছটফট করছে বুক। অস্বস্তিটা সইয়ে নেবার জন্যে ইদানীংকালের অভ্যাসে হাত বুলিয়ে নিল বুকে। হাত যতোটা জায়গা পরিক্রম করে তারই কোনোখানে আড়াল হয়ে আছে আক্রমণের পট-ভূমি—এই চেয়ারে, প্রায় এই অবস্থার মধ্যেই পরপর তিনটি তীক্ষ্ণ চোরা

ঢেঁকুরের ধরনে ধাক্কা দিয়ে অতর্কিতে কাত করে ফেলেছিল তাকে। তার বেশি কিছু নয়। তখন মরে গেলে মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে টের পেত না। এখন এটাই আদরের জায়গা—একই সঙ্গে তাকে এনে দিয়েছে সাত হাজার টাকা, প্রোমোশন, লীভ ট্রাভেল। তবু সারাক্ষণই কেন মনে হয় সে আর ঠিক আগের মতো নেই, তার অজ্ঞাতে কিছু একটা খুবলে বের করে নেওয়া হয়েছে শরীরের ভিতর থেকে! ক্রেডিটরস্ লেজারের এন্ট্রি গুলো আপ-টু-ডেট করতে করতে একই প্রশ্ন ফিরে এল আবার। মন বসল না। জলের গেলাসটা টেনে চুমুক দিতেই প্রতিটি ঢোঁক রসগোল্লার আকারে থেমে থেমে নামতে লাগল পেটে। এরকম হবে কেন! হাসপাতাল থেকে রিলিজ হবার আগে ডাক্তার বলেছিল, সবই করবেন, কিন্তু সবকিছু থেকেই টেনসন বাদ দেবেন। দুশ্চিন্তা এলেও সেটাকে চেঞ্জ করে নেবেন আনন্দে। লোভ বা তাড়াহুড়ো করবেন না কোনো ব্যাপারে। আর সবই নর্মাল—কোনটা আর কতোটা নর্মাল তা কিন্তু আপনাকেই ঠিক করে নিতে হবে। এখন পর্যন্ত ডাক্তারের নির্দেশ মেনেই চলেছে সে। একটু জোর করলেই যেটা এখনই পাওয়া যায়, উত্তেজিত না হয়ে অপেক্ষা করছে সেটার জন্যে। যে-খবরটা আজ বিকেলে দেবে বলে কথা দিল সহদেব, চাপ দিলে তিন দিন আগেই সেটা বের করে নিতে পারত সে, তা না করে আবার গেছে এবং তার পরেও আবার গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে আরোগ্য হয়ে ফিরে আসার কয়েক দিন পরে প্রথম যেদিন লীলা এক বিছানায় শুতে এল, সেদিনও, সান্নিধ্য থেকে আরও অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে—হঠাৎই মনে হয়েছিল এটা স্বাভাবিক নয়। প্রোমোশনের পরে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধেগুলো সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে এই যে তার ক্রমাগত যাওয়া এবং ফিরে আসা, এটাও কি স্বাভাবিক নয়? ইত্যাদি ভাবনায় উদাসীন হয়ে গেল প্রফুল্ল। টিফিনের সময় কৌটো থেকে মাখন-ছোঁকা ছানা বের করে ধীরে-সুস্থে খেতে খেতে ভাবল, না, সে স্বাভাবিকই আছে। যতোই অদম্য হোক কৌতূহল,

দুপুর যতোক্ষণ না বিকেলের দিকে এগোচ্ছে, ততোক্ষণই সহদেবের কাছে খবরের জন্যে যাবে না।

বিকেলের আগেই লোডশেডিং হলো। একে একে ক্রমশ অনেকেই ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে উঠে যাবার পর শশধর চক্রবর্তীর মুভমেন্টের ওপর নজর রাখল প্রফুল্ল এবং শশধরের উঠে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে এগুলো পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের দিকে।

সহদেব গুহও সম্ভবত ওঠার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। এই সময় প্রফুল্লকে সামনে দেখে বলল, 'আজকেই জানবেন, না কালকে জানলেও চলবে?'

'তুমিই বলেছিলে বিকেলে আসতে?'

'ঠিক আছে। বসুন।'

সহদেব গম্ভীর হলো। কিঞ্চিৎ বিরক্তও। বন্ধ দেরাজের তালা খুলে একটা ফাইল বের করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে থেমে গেল। খানিক কাগজটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, 'অ্যাডজাস্টমেন্টের পর গ্রেড ইনক্রিমেন্ট নিয়ে প্রায় শ' দেড়েক টাকা মাইনে বেড়ে যাবে আপনার—'

'যাক বাবা, বাঁচালে!' সহদেব মুখ তুলতেই পরিতৃপ্তি দেখাল প্রফুল্ল। একই উৎসাহে বলল, 'আর ঐ লীভ ট্রাভেলের ব্যাপারটা?'

জবাব না দিয়ে আবার ফাইলে চোখ রাখল সহদেব। পরে বলল, 'ওটাও পাবেন। দু' বছরে একবার। লীভ ট্রাভেল না নিলে পার হেড ম্যাক্সিমাম পাঁচশো টাকা এনক্যাশও করতে পারেন। আপনি, আপনার স্ত্রী আর ষোল বছর বা তার কম বয়স পর্যন্ত তিন ছেলেমেয়ে—'

এই কথার পর প্রফুল্লর মুখের রেখা পাল্টাতে লাগল। অদ্ভুত চোখে তাকাল সহদেবের দিকে। তাকিয়েই থাকল! তারপর বলল, 'তবে যে শুনেছিলাম গোটা ফ্যামিলির জন্যে!'

'আগে ছিল। এখন নিয়মকানুন পাল্টে গেছে।'

'আমার বেলাতেই সব নিয়ম পাল্টে যাচ্ছে নাকি!'

'আপনাকে আলাদা করে কোম্পানীর লাভ কী?' সহদেব বলল,

'এই বাবদ যা পাবেন আগে তো তাও পেতেন না ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে মাথা ঝোঁকালো প্রফুল্ল। সেই অবস্থাতেই বলল, 'আমার বড়ো ছেলে—তার কী হবে ? এদিকে তো বোনাসও পাবো না !'

'সব সুবিধে কি একসঙ্গে হয় !' সহদেব নড়ে বসল। হাতের ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'এখনো সব পেপারস্ তৈরি হয়নি। আজকালের মধ্যে ফর্ম পাঠিয়ে দেবো আপনার কাছে। ফ্যামিলি সাইজের ডিটেল্স্ রেকর্ড করাতে হবে—। আর কিছু ?'

প্রফুল্ল মাথা নাড়ল। দেখল, দেরাজ বন্ধ করে ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছে সহদেব। তখন ফাঁকা ঘরে বসে থাকতে থাকতেই সে অনুভব করল, বুকের ভিতর থেকে খুবলে বের করে নেওয়া জায়গাটা ক্রমশ ভবে উঠছে জলে, ভারী লাগছে শরীর। তা সত্ত্বেও সে একটা হিসেবের দিকে এগোবার চেষ্টা করল এবং কোনো হিসেবেই মেলাতে না পারায় পুনরায় ফিরে এলো নিজের জায়গায়। এইখান থেকেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। বাড়ি না ফিরলে হাসপাতাল থেকে শ্মশানেই যেতে হতো—চিতা নিবে গেলে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরত সুপ্রভাত। এ ক্ষেত্রে সে নিজে বাড়ি ফিরলেও ফলটা থেকে যাচ্ছে একই। লীভ ট্রাভেলের সুবিধাটা ষোলয় আঁটকে থাকলে ডলিও বাদ যেত, আপাতত বিয়েটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে। মলি এখনই ষোল, স্কুলের খাতায় যদিও পনেরো। তার মানে, এই বছরটা পার হলে মলিও চলে যাবে বেড়ার ওদিকে। এ তো শালা হারাধনের অঙ্ক ! বাকী থাকে সুব্রত; তৃতীয়বারের সুযোগ আসার আগে সেও চলে যাবে শরতার বাইরে। তখনও তার চাকরি বাকী থাকবে তিন বছর। এদিকে বোনাসটাও গেল ! ভূ-ভারতে এমন কোনো দূরত্ব নেই যেখানে যেতে এবং আসতে কাটছাঁট করা প্রফুল্লর পরিবারের পিছনে আড়াই হাজার টাকা ঢালতে হবে কোম্পানীকে। তাহলে তার লাভ হলো কি ?

এইসব চিন্তা নিয়ে যখন বাড়ি ফেরে তার চেয়ে অনেক দেরি করে

বাড়ি ফিরল প্রফুল্ল। লীলাকে একান্তে পেয়ে বলল, 'প্রোমোশন রিফিউজ করলে নাকি চাকরি যায় ; না হলে তাই করতাম—'

'কী হলো আবার ! ঝগড়াঝাঁটি করোনি তো !'

'কী আর হবে ! কোনোকালে যার কিছু হয়নি, এখনো হবে না। এর চেয়ে মরে গেলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় তোমরা কিছুদিন সুখ করে নিতে পারতে—'

বলতে বলতে শোবার ঘরের অন্ধকারে পা দিল প্রফুল্ল। বিছানায় শুয়ে এক পায়ে গোটানো হাঁটুর ওপর আর এক পা তুলে, হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকে পড়ল গোলমেলে হিসেবের খাঁচায়।

৫

সেদিন গভীর রাতে তার প্রতি সমস্ত বঞ্চনার প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে পঞ্চম সন্তানের জন্মদানে প্রবৃত্ত হলো প্রফুল্ল বিশ্বাস। লীলাকে বলল, 'তিপান্ন বছরে পৌঁছে কোনো লোক লীভ ট্রাভেলের সমস্ত সুযোগ নিতে পারে না এটা ওদের জানা উচিত ছিল। চার বছর যেতে না যেতে সব ফেসেলিটিজ লাটে উঠবে। আমি গাঁড়ল নই। ওরা ওদের নিয়ম মেনে চলুক, আমিও জের টানব—'

স্বামীর ইচ্ছায় কোনোদিন আপত্তি করেনি লীলা। তবু আজকের গোঁ-টা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। কিছু বা বিমূঢ়, কিছু বা লজ্জিত গলায় বলল, 'এতোদিন পরে আবার ! ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে গেছে, লোকেই বা বলবে কি !'

'লোকের পারমিশান নিয়ে আগেরগুলো জন্মায়নি।'

বরাবরই একরোখা, একবার অধৈর্য হলে ফেরানো মুস্কিল। চেনা লোককেও এই সময় অচেনা লাগে লীলার—প্রফুল্ল আর তার দেখায়

তফাৎ আছে। বেড়ানো অনেক হলো, ওকে বোঝানো যাবে না এটা ওদের থিতু হয়ে বসবার সময়। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় শেষ হয়ে আসে মহাদেশের মাটি, তার পরেই সমুদ্র। প্রফুল্ল কি এসব বুঝবে! কোনোরকমে অনিচ্ছাটুকু আড়াল করে লীলা বলল, 'আমার বয়সও কি কম হলো গো!'

'আমার জন্মের সময় আমার মায়ের বয়স ছিল উনপঞ্চাশ।' প্রফুল্ল বলল, 'তারও তিন বছর পরে লাড়ু জন্মায়।'

'মা গো!' ক্ষুণ্ণ গলায় বলল লীলা, 'তোমার জেদ মেটাতে আমি এখন আঁতুড়ে ঢুকি! ওই লীভ ট্রাভেলের টাকায় তুমিই বেড়িও।'

একটুক্ষণের জন্যে চুপ করে থাকল প্রফুল্ল, হিসেবে কোনো গোলমাল হচ্ছে কি না ভেবে নিল। তারপর স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার গলায় বলল, 'যাবে তো ফার্স্ট ক্লাসে! এখন মেডিক্যাল বেনিফিটও দেদার, কোম্পানীর টাকায় দিব্যি নার্সিং হোমে ঘুরে আসতে পারবে। অতো ভাবনার আছেটা কি!'

একটি রোমশ অনুভূতি

ধরণী যে গুণবান এবং আর পাঁচজনের স্বামীর চেয়ে আলাদা, বিয়ের আগে এই খবরটা পেয়ে মনে মনে গলে গিয়েছিল অশোকা।

বড়লোকের মেয়ে। তার ওপর একমাত্র। ছোটবেলা থেকেই প্রাচুর্য এমনভাবে ছেঁকে ধরেছিল যে চাওয়ার ব্যাপারে কোনোদিনই নজর নিচু করার কথা ভাবেনি। চাইবার আগেই পেয়ে যেত সব কিছু। কী কী তা বলবার দরকার নেই কোনো। ধরা যাক পয়সা ও উদ্যম যা যা দিতে পারে সবই। তারপর, শারীরিক কারণে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ও ব্রেসিয়ার ধরার পর যখন বুদ্ধিতেও শান পড়ল আগের চেয়ে বেশি, তখনই, হঠাৎ একদিন—এক শনিবারের বিকেলে, ডানলোপিলোর বিছানায় শুয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর ডান পা তুলে ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে হাউসকোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়া নিজের চমৎকার পায়ের হালকা বাদামী রোমগুলির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল অশোকা এবং ভাবল, না চাইতেই সব কিছু পাওয়ার মধ্যে সার্থকতা নেই তেমন। একবার চেয়ে দেখলে কেমন হয়!

সঙ্গে সঙ্গে ঝোঁক চেপে গেল মাথায়। বুদ্ধিমতী মেয়ে অশোকা; কী কী চাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে এ-কথাও ভেবে নিল যে এমন কিছু চাওয়া যায় না যা জোগাড় করতে বিস্তর অসুবিধেয় পড়বে বাবা কিংবা মা! ওরিজিনালিটি থাকে, যদি এমন কিছু চাওয়া যায় যেটা বস্তু হিসেবে আহামরি কিছু নয়—হীরের আংটির মতো দামী কিছুও নয় যা সঙ্গে সঙ্গে পাবার জন্যে এই সন্ধেবেলায় ব্যাঙ্ক বন্ধ বলে চেক ভাঙাবে কোথায় এই চিন্তায় ঘাম দেখা দেবে বাবার কপালে, কিংবা চৌরঙ্গির গয়নার দোকান যাতে এক-আধ ঘণ্টা বেশি খুলে রাখা হয় সেজন্যে

উত্তেজিত হয়ে টেলিফোন করতে হবে মাকে। কী সেই বস্তু, ভাবতে ভাবতে ম্যাগাজিনের পাতায় একটি বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল অশোকার—মাঝ সমুদ্রে স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর ছবির দিকে তাকিয়ে ধক্ করে আইডিয়াটা এসে গেল মাথায়।

রাবড়ি। এক ভাঁড় ঘন সর পড়া রাবড়ি—চাইবার জিনিস হিসেবে নিশ্চয়ই সাধারণ। তবে কি না জোগাড় করতে গেলে একটা সাসপেন্স্-এর ভিতর দিয়ে যেতে হবে।

অশোকা উঠে পড়ল।

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে বিশাল বাড়ির পিছনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন হরপ্রসাদ ও বিভা। আনমনে একবার লনে পায়চারি করে এসে ওঁদের সামনে দাঁড়াল অশোকা।

'কী রে, খাবারটা দেবো এবার?' বিভা বললেন, 'স্কুল থেকে ফিরে কিছুই তো খেলি না!'

'কেন, খেল না কেন!' হরপ্রসাদ বললেন, 'আজ শনিবার। স্কুল থেকে তো অনেকক্ষণই ফিরেছে—'

'অনেকক্ষণ বলে অনেকক্ষণ! সেই তিনটেয়—'

'তার মানে ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল!'

'তিন ঘণ্টা কি, আরও বেশি বলো! এখন ছ'টা পঁয়ত্রিশ!'

'কী কাণ্ড!'

বাবা ও মার মধ্যে পাঁচটা ডায়লগ বিনিময়ের পর উদাসীন গলায় অশোকা বলল, 'ক্ষিদে না পেলে কী করা যাবে!'

মেয়েকে যতোটা সম্ভব খুঁটিয়ে দেখে হরপ্রসাদ বললেন, 'এই বয়সে খাবার মুখে দিলেই ক্ষিদে পায়।'

'তুই বোস দিকি এখানে।' বিভা বললেন, 'আমি এনে দিচ্ছি—'

বিভাকে উঠতে দেখে চেয়ার টেনে বসতে বসতে অশোকা বলল, 'কী খাবার আজ?'

'রোজ আর নতুন কী দেবো! বিকেলে শশাঙ্ককে দিয়ে রাতুর

দোকানের চিংড়ির কাটলেট আর ফ্রাই আনিয়েছিলাম—'

'ব্যাব্যাঃ!' অরুচির ভান করল অশোকা, 'সেই কাটলেট আর ফ্রাই! কতো যে খাবো!'

'ভীম নাগের তালশাঁস আছে। দেবো দুটো?'

'ওফ্! বলো বাবা, রোজ রোজ একই খাবার খেতে ভালো লাগে কারো!'

'তুমিই বলো না, মা, কী খাবে?' সহানুভূতির গলায় বললেন হরপ্রসাদ, 'যা খেতে ইচ্ছে করে বললেই তো পারো!'

বিভা দাঁড়িয়ে, হরপ্রসাদ চিন্তিত—দু'জনেই তাকিয়ে মেয়ের দিকে, অশোকা বলল, 'অনেকদিন রাবড়ি খাইনি—'

'রাবড়ি খাবে?'

হরপ্রসাদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

বিভা বললেন, 'এতোক্ষণ বললেই পারতিস! ইচ্ছের কথা চেপে রাখতে নেই। শশাঙ্ককে ডাকি। এনে দিক গাঙ্গুরাম থেকে—'

'না, না, সে-রাবড়ি নয়'।

বিভা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, 'সে-রাবড়ি নয়' শুনে ফিরে দাঁড়ালেন।

'তাহলে আবার কোন রাবড়ি!'

'যা ইচ্ছে মুখ ফুটে বলো না?' মেয়েকে প্রশ্রয় দিলেন হরপ্রসাদ, 'সামান্য রাবড়ি তো!'

একটু আগে দেখা বিজ্ঞাপনের ছবিটা ঠিক-ঠিক মনে করে ঢোঁক গিলল অশোকা। আলগা চোখে একই সঙ্গে তাকিয়ে নিল বাবা ও মার দিকে।

'সেন্টাল অ্যাভিনিউ আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে একটা দোকান আছে—কী যেন পার্ক আছে একটা, তার উল্টোদিকে। শ্যামলী বলছিল বেস্ট—'

মেয়ের কথা শুনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন হরপ্রসাদ ও বিভা। হরপ্রসাদ বললেন, 'বেশ তো, আনিয়ে দেওয়া যাবে একদিন। এ-পাড়ার

রাবড়িই বা কম বেস্ট কী! আজ না হয় তাই খাও?'

'ঠিক আছে, আর একদিন খাবো বরং। আজ এমনিতেই খিদে নেই।'

'ওই ছ্যাখো!' ব্যস্তভাবে বললেন বিভা, 'ড্রাইভার তো আছে এখনো। ওকেই পাঠিয়ে দিই। কী বলো?'

'তাই দাও। একটু বেশি করে আনতে বোলো। ফ্রীজে রেখে দিলেই চলবে—'

এই সংলাপের মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গেটের মুখে গাড়ি বেরিয়ে যাবার হর্ন শুনে অশোকা বুঝে নিল চাওয়া কাকে বলে। নিজের মনেই কল্পনা করে নিল রাস্তাটা। সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি নিয়ে পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ড্রাইভার। গনগনে উনোনের ওপর বসানো বড়ো কড়াইয়ে জ্বাল খেতে খেতে দুধ পরিণত হচ্ছে পুরু সরে। গাড়ি ও রাবড়ির মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশ।

রাবড়ি দিয়েই সেদিন থেকে অদ্ভুত একটা স্বভাব তৈরি হয়ে গেল অশোকার—যা পাওয়া যায় সেটাকে ভালো বলে মনে হয় না, পরিবর্তে অন্য কিছু পাবার জন্যে অদ্ভুত জেদ চেপে যায় মাথায়। আর যতোক্ষণ সেই অন্য কিছুটা না পাচ্ছে ততোক্ষণই হাত-পা কামড়াতে শুরু করে অস্বস্তিতে, জ্বালায়, কখনো বা রাগে।

লেখার শুরুতেই এসে গিয়েছিল ধরণী নামের গুণবান এক যুবা, যাকে স্বামী হিসেবে কল্পনা করে মনে মনে গলতে শুরু করেছিল অশোকা। ইতিমধ্যে অশোকার যৌবনপ্রাপ্তি ও রাবড়ি নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টির বর্ণনা এসে পড়ায় অনেকেরই সন্দেহ হতে পারে, ওই গলে যাওয়ার অনুভূতির সঙ্গে রাবড়ির গলাগলা চেহারাটুকুর সাদৃশ্য টেনে চলেছে একটা মারপ্যাঁচ সৃষ্টির চেষ্টা। আজ্ঞে, তা নয়। তবে, রাবড়ির মতো একটি তুচ্ছ খাদ্য নিয়ে ইচ্ছাপূরণের যে-কাণ্ডটি বাঁধিয়ে বসল অশোকা, তা থেকে নিশ্চয়ই তার মানসিকতার আন্দাজ পাওয়া যায় কিছুটা। আমাদের অভিজ্ঞতা

বলে ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যেই চেনা যায় মানুষকে। তবে, শুধুই রাবড়ি দিয়ে অশোকাকে বিচার করলে ভুল হবে মস্ত। অশোকা সম্পর্কে এখনো যে-কথাগুলি বলা হয়নি তা হলো, সে সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী—সত্যি বলতে, রূপ এবং খাঁজকাটা যৌবনের এমন মেলামেশা এক শরীরে বড়ো একটা দেখা যায় না। উপরন্তু সে বুদ্ধিমতী ও স্মার্ট, বাপ মায়ের আদুরে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়ায় ভালো, লেডী ব্রেবোর্ন ও তার পরে ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় অনেকেই এক ডাকে চিনত তাকে। গোপনে অনেকেই ছড়াতো অনেক রকম কল্পনার জাল। রূপে গুণে যে-মেয়ে এমন প্রখর তাকে ঘিরে একটা ব্যক্তিত্বের আড়ালও যে থাকবে সব সময়, এ তো জানা কথা!

এই মেয়ের অহঙ্কারও থাকবে এবং স্বামী কেমন হবে না হবে, থাকবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। বেয়াল্লিশটি সম্বন্ধ বাতিল হবার পর অশোকার ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে গেল ধরণী।

আসুন, এবার ঢুকে পড়া যাক আসল গল্পে।

সম্বন্ধ করেছিলেন অশোকার মেজমামা। বললেন, 'ছেলেটি উচ্চ-শিক্ষিত তো বটেই, খোঁজ নিয়ে জানলাম প্রচুর সুনামেরও অধিকারী! ফিজিকাল এনার্জি নিয়ে রিসার্চ করে ডক্টরেট হয়েছে। অমায়িক কিন্তু ব্যক্তিত্ববান। এটা খুব ইমপর্ট্যান্ট।'

বসার ঘরে সোফায় বসে পাইপ টানছিলেন হরপ্রসাদ। বললেন, 'নিশ্চয়ই। পার্সোনালিটি না থাকলে পুরুষ মানুষের আর থাকল কি? আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরই ওটা থাকে না।'

বিভা বললেন, 'আমাদের অশোকার পার্সোনালিটিও কিছু কম নয়।'

'হুঁ। ওই মেয়ের যোগ্য হবার জন্যে স্ট্রংগার পার্সোনালিটি দরকার।' মেজমামাকে চিন্তিত দেখাল অল্প, 'তবে—'

'তবে কী! ছেলেটি কি মদ্যপ? অন্য দোষটোষ নেই তো?'

'না, না। ওসব কিছু নয়।' চিন্তিত হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মেজমামা বললেন, 'বিত্তবান নয়। নিজেদের বাড়ি নেই। ভাড়া

করা ফ্ল্যাটে থাকে। ফ্ল্যাটটি বড়োই। নিঝঞ্ঝাট। থাকার মধ্যে বুড়ি মা। তা তিনি কখনো এই ছেলের কাছে থাকেন, কখনো নিউ আলিপুরে বড়ো ছেলের কাছে — '

'খুবই ভালো।' হরপ্রসাদ বললেন, 'বিত্তবান হবার দরকার কি! আমরা চলে গেলে সবই থাকবে অশোকার জন্যে। জামাইয়ের আপত্তি না থাকলে এখানে এসেও থাকতে পারে—'

অশোকা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। হরপ্রসাদের শেষের কথাটা শুনে মুখ খুলল।

'আমি কিন্তু ওই ফ্ল্যাটেই থাকব, বাবা!'

'বেশ তো। দরকার হলে ওই ফ্ল্যাটকেও ঢেলে সাজিয়ে দেবো। মজুমদারকে বলব একদিন গিয়ে সব দেখেশুনে আসতে।'

'সবই ভালো।' বললেন বিভা, 'এখন মেয়ে মন মেজাজ ঠিক রেখে মানিয়ে চলতে পারলেই হয়। লেখাপড়া জানা বিদ্বান জামাই, নিশ্চয়ই রাশভারি হবে!'

'তুমি মা এমন করে বলছ যেন পান থেকে চুন খসলেই মারধোর করবে!' খুশি আড়াল-করা গলায় অশোকা বলল, 'ড্যাবলা হওয়ার চেয়ে রাশভারি হওয়া অনেক ভালো —'

বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের রাতেই ব্যাপারটার একটু-আধটু আভাস পেয়েছিল অশোকা; পুরোপুরি ধারণায় পৌঁছুতে কেটে গেল আরও কয়েকদিন। ধরণী যে বিদ্বান ও ব্যক্তিত্ববান, কম কথার মানুষ--এবং ভদ্র, অমায়িক ও সামাজিক ব্যবহারে পটু, তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই কোনো। এইসব কারণেই নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল অশোকার। কিন্তু, সমস্যাটা অন্য। লোকটি যেন একটু গায়ে-পড়া ধরনের! সুযোগ পেলেই ছুঁকছুঁক করে—পাত্র যদি বা মানে, স্থান-কালের জ্ঞান থাকে না কোনো।

অশোকাও যে এসব পছন্দ করে না তা নয়। সত্যি বলতে, মুখ

ফুটে না বললেও সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই ও খুঁজে পাচ্ছিল এক ধরনের চরিতার্থতা। কিন্তু, আরও কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ একদিন খেয়াল হলো অশোকার, এই পাওয়াটা পাওয়া নয়—না চাইতেও পাচ্ছে বলে, পাওয়ার সুখটাও কমে যাচ্ছে ক্রমশ। মনে হয় সমস্ত ব্যাপারে তাকে সুখী করার জন্যে ধরণীর আগ্রহই কাজ করছে বেশি। এটা কেন হবে! নাকি তার কপালটাই এমন যে যখন যেখানে যাবে কিংবা থাকবে, না চাইতেই পেয়ে যাবে সবকিছু! সব রকমের পরিপূর্ণতা দানের জন্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত এইরকম একটি লোকের সঙ্গে সারাজীবন ঘর করতে হবে ভাবলেই গা সিরসির করে ওঠে কেমন! যে-জীবনে থ্রীল নেই, সারপ্রাইজ নেই, একসাইটমেণ্ট নেই, কনট্রাস্ট নেই, শক্ নেই—এবং ইত্যাদি আরও কী কী যেন নেই, সেটা একটা জীবন নাকি!

ভাবনাটা পেরেক পুঁতে দিল মাথায়। বিয়ের পর মাস দুয়েক যেতে না যেতেই নিজেকে কিংবা ধরণীকে জুতসই পরীক্ষায় ফেলবার জন্যে অলিগলি খুঁজতে শুরু করে দিল মাথায়। অশোকা ভেবে নিল, বিদ্যা, ব্যক্তিত্ব ও স্ত্রীকে তোয়াজে রাখাই কোনো পুরুষের ডেফিনেশন হতে পারে না। এমন কিছু ভেবে নিয়ে থাকলে নিশ্চিত ভুল করেছে ধরণী।

একদিন রাত্রে আলো নিবিয়ে বিছানায় উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে পড়ার স্বভাব থেকে ধরণী কাছে এগিয়ে এলে অশোকা বলল, 'কী চাও!'

ধরণী বলল, 'কেন!'

'কেন আবার কি!' অন্ধকারে চোখ মুখের অভিব্যক্তি ধরা না গেলেও ধরণীর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলার স্বরে মজা পেয়ে অশোকা বলল, 'সারাক্ষণ এইভাবে গায়ে পড়তে ভালো লাগে?'

'কেন!'

নিশ্চিতভাবে অবাক ধরণীকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে নিজেকে গুছিয়ে নিল অশোকা। এতো রাত্রে বিবেকানন্দ রোড থেকে রাবড়ি কিনে আনতে বলা যাবে না। তাছাড়া, যে আবদার বাপ-মার কাছে

করা যায় স্বামীর কাছে কি তা করা যায়! দু'জনের রক্ত আলাদা। ধরণী তাকে পাগল ভাবতে পারে।

অশোকা খেয়াল করল, তার দুটি প্রশ্নেরই একই উত্তর দিয়েছে ধরণী—কেন! এবার ওকে অন্যভাবে অ্যাটাক করা যেতে পারে। তখন বলল, 'তোমার কখনো মনে হয় না এসব করে কিছু হয় না—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে উত্তর মেরুতে চলে যাই?'

'কেন!'

'কেন, কেন, কেন!' সিলিংয়ের দিকে মুখ করে উর্ধ্বে হাত ছুঁড়ল অশোকা। গলায় কৃত্রিম অভিমান ফুটিয়ে বলল, 'এতো মাথা ব্যথা করছে!'

'তাই বলো—', ধরণী বলল, 'এতোক্ষণ বললেই পারতে মাথা ধরেছে!'

'বলতে হবে কেন! বুঝতে পারো না!'

'মাথা ধরেছে বুঝব কী করে!'

'যে করে আর সব বোঝো!' অশোকা নিজেকে জিইয়ে রাখল, 'এইতো সেদিন বলছিলে আমার শরীর নাকি কথা বলে!'

অসহায় গলায় ধরণী বলল, 'সেটা আলাদা ব্যাপার!'

'আলাদা ব্যাপার! মাথাটা শরীরের থেকে আলাদা!'

অশোকাকে তার উল্টোদিকে পাশ ফিরে শুতে দেখে ধরণী বলল, 'টিপে দেবো?'

অশোকা চুপ করে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পরে জিজ্ঞেস করল, 'ধরো যদি মাথা ব্যথা না করে পায়ে ব্যথা করত, টিপে দিতে?'

ধরণী বোধহয় বুঝতে পারল অশোকা সিরিয়াস নয়, তামাশা করছে তাকে নিয়ে। তখন শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'দিতাম হয়তো। যদি বুঝতাম ব্যথাটা ঠিক কোথায়।'

স্বামীরা সরল হয় না। বাবা-মা হলে এতোক্ষণে ফোন চলে যেত ডাক্তারের কাছে; কিছু না হোক যে-কোনো একটা অ্যানালজেসিক এবং

এক গ্লাস জল এসে পড়ত সঙ্গে সঙ্গে। সেসব দিকে না গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল লোকটা। কিছুক্ষণ পরেই হয়তো জিজ্ঞেস করবে, মাথা ব্যথা ছেড়েছে ? নাঃ, এসব সস্তা চালে ভোলানো যাবে না ধরণীকে। নতুন কিছু ভাবতে হবে—থ্রীলিং কিছু, যাতে ধরণী যেমন তার চেয়ে আলাদা হয়ে যায় একটু ; স্ত্রীর এই চাওয়াটা পূরণ করতে না পারার টেনসনে ভুগবে।

পাশ ফিরে স্বামীর দিকে মুখ করে শুলো অশোকা। দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্যে হাত বাড়িয়ে চিবুক টিপে ধরল ধরণীর।

'ফিজিকাল এনার্জি নিয়ে কী নাকি বিরাট থিসিস লিখেছিলে, মেজমামা বলেছিলেন। তো মশাই, ব্যাপারটা কী ?'

'ও সায়েন্সের ব্যাপার। তুমি বুঝবে না!'

অশোকা বলল, 'সায়েন্স আর্ট্‌স্ বুঝি না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি। বিয়ের পর হলে এনার্জি নিয়ে থিসিস লেখার এনার্জি আর থাকত না তোমার !'

সেদিনের সুযোগ ব্যর্থ হলেও সহজে মাথা থেকে ভূত নামাতে পারল না অশোকা। বরং পাওয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে চাওয়ার চিন্তাটা বেড়েই যেতে লাগল ক্রমশ। ভাবে, আনমনা হয়ে যায়—এমনকি কখনো কখনো ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে পেতে চায় যে কোনো একটা ধারণা। এমন কোনো চাল যা সহজে এড়াতে পারবে না ধরণী। সোনাদানা চাইলে হাস্যকর শোনাবে। বিয়ের সময় মা এতো দিয়েছে যে এখনো তার অর্ধেকও ব্যবহার করে উঠতে পারেনি। তাছাড়া, এগুলো ধরণীর সেন-সিটিভ জায়গা। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সিতে চড়ে কলেজে যায় দেখে বাবা একটা গাড়ি ধার দিতে চেয়েছিল ; ধরণী শুধু 'না'ই করেনি, বাড়ি ফিরে কথা শুনিয়েছিল অশোকাকে—'গাড়ি বেশি থাকলে কোনো চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনকে দান করে দিতে বলো না কেন !'

অশোকা জবাব দেয়নি। ওই যখন-তখন গায়ে পড়ার ব্যাপারটা ছাড়া এতোদিনেও আর কোনো দুর্বলতা চোখে পড়েনি লোকটার।

তক্কে তক্কে থাকতে থাকতে সুযোগ এসে গেল একদিন।

দোতলা ফ্ল্যাটের পিছনের বারান্দায় দড়িতে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার শুকোতে দিয়েছিল অশোকা। আকাশে ঝড়ের সম্ভাবনা দেখে তুলতে গিয়ে দেখল, আর সবই আছে ঠিকঠাক— শুধু ব্রেসিয়ারটাই উধাও।

বিয়ের তত্ত্বে পাওয়া জার্মান মেকের ব্রেসিয়ার, শেপ আর কমফর্টে জুড়ি নেই। পরলে মনেই হয় না কিছু পরেছে। মেজমামার বড়ো ছেলের বউ, রীতা বউদি, এনে দিয়েছিল মিউনিখ থেকে। হারিয়ে যাবার সম্ভাবনায় ছটফট করে উঠল মনটা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল খোঁজা— সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়। এমন কি হতে পারে ব্রেসিয়ারটা সে আগেই তুলে নিয়েছিল কিংবা আদৌ শুকোতে দেয়নি তারে!

ইজিচেয়ারে আয়েস করে বসে একটা মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল ধরণী। ফিরে ফিরে কয়েকবার অশোকাকে আলনা ঘাঁটতে দেখে বলল, 'অমন হুটোপাটি করে কী খুঁজছ বলো তো?'

'আমার ব্রেসিয়ারটা!'

'ব্রেসিয়ার!'

'হ্যাঁ। কালো রঙের জার্মান ব্রেসিয়ারটা। শাড়ি জামার সঙ্গে শুকোতে দিয়েছিলাম তারে। এখন দেখছি নেই!'

'দ্যাখো কোথাও উড়ে-টুড়ে গেল কি না!'

অশোকাকে বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বই বন্ধ করে উঠে এলো ধরণী। রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে একই সঙ্গে নিচে তাকাল দুজনে এবং হঠাৎই ব্যাপারটা চোখে পড়ল ধরণীর। নিচের কোর্ট ইয়ার্ডে অশোকার ব্রেসিয়ারটা মুখে করে ছুটোছুটি করছে ছোট্ট ও সাদা একটা রোমশ কুকুর। বলল, 'ওই দ্যাখো!'

'ও মা!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল অশোকা, 'কী হবে!'

'কী আর হবে! এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ছিঁড়ে ফেলেছে!'

এই সময়, যখন বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে ধরণী ও অশোকা দুজনেই একটি সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখের

আড়াল হওয়া কুকুরটি ফিরে এলো ঠিক তাদেরই বারান্দার নিচে এবং কারুর 'আয়, আয়' ডাক শুনেই সম্ভবত, ব্রেসিয়ারটি ফেলে দিয়ে ছুটে গেল অন্যদিকে।

পুরো দৃশ্যটি অশোকা লক্ষ করল শ্বাস বন্ধ রেখে। কোর্ট ইয়ার্ডে দারুণ অবহেলার মধ্যে পড়ে আছে তার প্রিয় কালো ব্রেসিয়ার, তীক্ষ্ণ চোখে সেটাকে দেখতে দেখতে বলল, 'দেখে তো মনে হয় না ছিঁড়ে ফেলেছে। বাঁ-দিকটা ছ্যাখো, কেমন ঠিক-ঠিক উঁচু হয়ে আছে—'

'ডান দিকটা দেখা যাচ্ছে না—'

'তোমার খালি কথা!' রেলিংয়ে থাপ্পড় মেরে অধৈর্য দেখাল অশোকা, 'যাও না একবার নিচে! কুড়িয়ে আনো না!'

'লক্ষ্মীকে পাঠাও।'

'লক্ষ্মী নেই। লণ্ড্রিতে গেছে।'

গম্ভীর গলায় ধরণী বলল, 'ওইটুকুন তো একটা জিনিস! তার জন্যে এতো ছটফট করছ কেন!'

'ওইটুকুন ওইটুকুন কোরো না তো! বিদেশী জিনিস। তুমি কোনো কাজের নয়। যাও না?'

'সবাই দেখুক, বউয়ের ব্রেসিয়ার কুড়োতে—'

ধরণী কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই আবার খরগোসের ধরনে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো কুকুরটি। দু পায়ের থাবায় ড্রিবল করার ভঙ্গিতে ব্রেসিয়ারটি নাচাতে নাচাতে একসময় খপ্ করে তুলে নিল মুখে; তারপর আহ্লাদে আটখানা ভাব করে পিছন ঘুরে দৌড় দিল চকিতে।

ধরণী বলল, 'কুকুরটাও বিদেশী!'

'ইউজলেস! তুমি একেবারে ইউজলেস!'

'ভালো করে ক্লিপ না এঁটে দিলে উড়ে যাবেই—'

'কী করে জানবো যে ওই ভিজে জিনিসটা কাগজের মতো—', বলতে বলতে চুপ করে গেল অশোকা। ফ্যাকাশে মুখে তাকাল ধরণীর দিকে।

অশোকার দৃষ্টি অনুসরণ করে কোর্ট ইয়ার্ডের বাঁদিকে তাকিয়ে মহিলাকে দেখতে পেল ধরণী। চাপা গলায় ব লল, 'ফিফ্থ্ ফ্লোরের মিসেস ভড়। কালই দেখছিলাম চেনে বেঁধে ঘুরছেন। নতুন বোধহয়।'

'দেখছ কীভাবে 'ফেলে দাও, ফেলে দাও' করে চ্যাঁচাচ্ছে—যেন পচা মাছ মুখে দিয়েছে!'

'ও দেখে আর কী হবে!' সান্ত্বনা দেবার ছলে বলল ধরণী, 'নিয়ে এলেও আর পরতে পারতে না। ঘেন্না লাগত। এবার থেকে বরং সাবধান হোয়ো।'

তখনকার মতো চুপ করে গেলেও ব্রেসিয়ার হারানোর দুঃখটা ভুলতে পারল না অশোকা। মুখ ভার করে থাকল গোটা বিকেল ও সন্ধ্যে, যে-কথা না বললেই নয় তা ছাড়া বলল না কিছু। এমন কি শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে রাতের খাওয়াটাও এড়িয়ে যাচ্ছিল, ধরণী ভুরু কোঁচকাতে দায়সারা ভাবে মুখে দিল কিছু। অন্যদিন শুতে যাবার আগে অন্ধকারে বসে কিছু গল্পগুজব করে তারা। আজ সেটাও বাদ দিল অশোকা। একা বসে থাকতে থাকতে ধরণী দেখল, ঘরের আলো নিবিয়ে চুপচাপ বিছানায় উঠে যাচ্ছে অশোকা।

সেদিন রাত্রে ধরণী তার স্ত্রীর গায়ে পড়ার চেষ্টা করতেই শরীর কুঁকড়ে অশোকা বলল, 'অনেক হয়েছে। এখন চুপচাপ শুয়ে থাকো। এদিক ঘেঁষো না।'

'কেন!'

'কেন-ট্যানো জানি না। সম্পর্ক বলতে শুধু একটা। যেন আমার কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই!'

'এমন কী হয়েছে যে এসব বলছ!'

অশোকা জবাব দিল না। ছড়ানো আঁচলটা বুক, গলা, পিঠে ভালো করে জড়িয়ে হাত চাপা দিল চোখে। খানিক পরে উঠে বাথরুমে গেল এবং ফিরে এলো। এমনভাবে, যেন শুধু বিছানায় কেন, ওই ঘরে দ্বিতীয় কেউ উপস্থিত নেই।

অনেকটা সময় নিয়ে, অশোকা তখনো জেগে আছে অনুমান করে ভারী গলায় ধরণী বলল, 'তোমার কোন ইচ্ছেটা অপূর্ণ রেখেছি!'

'কী চেয়েছি যে এতো কথা বলছ!'

অশোকা যে সিরিয়াস ওর গলার স্বরেই তা স্পষ্ট। ধরণী বলল, 'চাইলেই পারো!'

'সবই মুখের কথা!' অশোকা হঠাৎ উঠে বসল বিছানায়, 'যা চাইব পারবে দিতে?'

'চেয়েই দ্যাখো—'

অশোকা দুম করে বলল, 'আমার একটা কুকুর চাই। পারবে এনে দিতে?'

কুকুর!'

'হ্যাঁ, কুকুর। পারবে?'

'বেশ তো। একটা কুকুর খুঁজলে পাওয়া যাবে না এ তো হতে পারে না—। এমন টং হয়ে আছো কেন!'

আবহাওয়াটা তরল করবার চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে টানতে গেল ধরণী। বৃথা। ব্যস্তভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অশোকা বলল, 'আগে কুকুর, তারপর অন্য কথা।'

অশোকা যে এইরকমই চেয়েছিল তা নয়, তবে টেনসনটা তৈরি হয়ে গেল নিজে থেকেই। অশোকার একার নয়, রোখ চেপে গেল ধরণীরও। পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল তার কুকুর নিয়ে খোঁজাখুঁজি।

অন্যদিন রাস্তায় বেরিয়েই সে মানুষ দেখে, তারপর দেখে বাস, ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সি, সাইকেল কিংবা স্কুটার, দোকান ইত্যাদি। আজ প্রথমেই চোখ গেল কুকুরের দিকে এবং সত্যিই অবাক হয়ে গেল ধরণী। এতো যে কুকুর ঘোরাফেরা করছে চারদিকে—ডাস্টবিন ঘাঁটছে, শালপাতা চাটছে, পেটে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে রাস্তায় কিংবা ভৌ মেরে তাড়া করছে অন্য কুকুরকে, এটা তার জানা ছিল না। তবে কিনা এর সবগুলিই রাস্তার কুকুর। জাতিতে বিশুদ্ধ নেড়ি, পেডিগ্রির ছাপ নেই কোনোটির

চেহারায়। কুকুর বলতে অশোকা নিশ্চয়ই এগুলিকে মীন করেনি। মুখ ফুটে না বললেও ধরণী ধরেই নিতে পারে, অশোকার মাথায় ছিল মিসেস ভড়ের কুকুরটির মতো কোনো একটি। বিলিতি বলতে যা বোঝায় আর কি!

কলেজে যেতে যেতে বেশ কয়েকটি 'কুকুর হইতে সাবধান' চোখে পড়ল তার, কিন্তু 'এখানে কুকুর পাওয়া যায়' গোছের নোটিশ একটিও নয়। তখনই বুঝতে পারল, কাজটা সহজ হবে না খুব। কিন্তু করতেই হবে। বিয়ের পর থেকেই বুঝতে পারছে বিয়েটা আরও অনেক আগেই করা উচিত ছিল তার এবং অশোকাকেই। এখন অশোকা বিগড়ে গেলে শুকিয়ে মরতে হবে তাকে। সুতরাং—

কারণ না বলেই একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল ধরণী। কলেজে সহকর্মী নিত্যানন্দ বলল, 'বউ পাহারা দেবার জন্যে নাকি! সুন্দরী বউ থাকার এই হলো প্রব্লেম, বাড়িতে রেখেও ভরসা করা যায় না।'

ঠাট্টাটা এড়িয়ে গিয়ে ধরণী বলল, 'রসিকতা ছাড়ো। কোনো খবর-টবর জানলে দাও।'

'কেনেল ক্লাবে খোঁজ করতে পারো। তা ছাড়া—', নিত্যানন্দ বলল, 'ও, হ্যাঁ, রবিবারের স্টেটস্‌ম্যানটাও দেখতে পারো—কেনেল অ্যাণ্ড লাইভস্টক কলাম, ওখানে অনেক ভালো জাতের কুকুরের বিজ্ঞাপন থাকে। কদিন আগে আমার শালা একজোড়া ওয়েলশ্‌ করগী কিনেছে। দারুণ জিনিস হে!'

ধরণী মাথা নাড়ল। অশোকার সঙ্গে দূরত্ব যতই বাড়ছে ততই নিজের মধ্যে জরুরী অবস্থাটা বেশি করে টের পাচ্ছে সে।

দিন কয়েক পরে একদিন দুপুরে অশোকাকে অবাক করে সত্যি সত্যিই বাড়িতে কুকুর এনে ফেলল ধরণী। মাঝারি, কিন্তু ভারী ও রোমশ, কুচকুচে কালো একটি স্পিৎজ্‌। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। জন্তুটাকে কোল থেকে নামিয়ে বলল, 'কী, পেয়েছ তোমার কুকুর!'

'ও ! মাই ডিয়ার হাসব্যাণ্ড !' ধরণীর গালে ঝপ করে ঠোঁট ছুঁইয়ে অশোকা বলল, 'ইউ আর গ্রেট !'

অশোকার হাতে বকলেশ ও চেনটা তুলে দিতে দিতে ধরণী দেখল একটু দূরে গিয়ে, ছড়ানো সামনের পা দুটির ওপর মুখ রেখে অদ্ভুত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে কুকুরটি। বলল, 'দেড় বছর বয়স মোটে নতুন জায়গায় অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগবে কিছুক্ষণ। একটু চাঙ্গা হয়ে নিক, তারপর চেনে বেঁধে রেখো।'

কুকুরটিকে দেখতে লাগল অশোকা এক দৃষ্টিতে। মনে হলো কুকুরটিও দেখছে তাকে। হঠাৎ 'ঘাঁউ' করে একটি শব্দ তুলেই ঝিমিয়ে পড়ল আবার।

'কুকুরের মালিক বলছিল তাড়াতাড়ি একটা নাম দিয়ে দিতে।' ধরণী বলল, 'প্রপারলি আইডেন্টিফায়েড না হলে নাকি ওরা অ্যাডজাস্ট করতে পারে না।'

'কী নাম দেওয়া যায় বলো তো?'

'ভেবে ছাখো।'

'ঠিক আছে। মাই ডিয়ার—মাই ডিয়ার—ডিয়ার—। আচ্ছা, ডিয়ার নামটা কেমন?'

'ভালোই তো।'

'ডিইই-য়ার!'

অশোকা বার তিনেক ওই নাম ধরে ডাকতেই আবার 'ঘাঁউ' শব্দ করল কুকুরটা, তারপর লেজ নাড়তে লাগল মৃদু।

তিনদিন পরে সেদিন রাতে দু'জনে ঘনিষ্ঠ হবার উপক্রম করছে; হঠাৎ কুঁই-কুঁই থেকে ঘ্যাঁক-ঘ্যাঁক শুরু হয়ে গেল ডিয়ারের। তারপরেই তারস্বরে ব্যতিব্যস্ত-করা চিৎকার।

সেই শব্দে কান রেখে অশোকা বলল, 'চেনটা খুলে দাও বরং। নতুন জায়গা—ভয় পেতে পারে। ঘোরাঘুরি করুক একটু—'

চেনটা খুলে দিয়ে আবার বিছানায় উঠে এলো ধরণী। তারপর

ফিরে গেল উপক্রমণিকায়। অন্ধকার মাঝে মাঝে অন্যরকম হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায়, অশোকা হঠাৎ বলল, 'এই ছাড়ো—ছাড়ো তো—!'

'কেন!'

আধশোয়া অবস্থায় অশোকা বলল, 'দেখছ! কী ভয়ঙ্কর চোখ দুটো! কী জ্বালাতন!'

ধরণীও উঠে বসেছিল। অন্ধকারে গাঢ় সবুজ দু'টি অগ্নিবিন্দুর দিকে তাকিয়ে কিছু আঁচ করতে পারল যেন। প্রায় হিম হয়ে এলো হাত-পা। চাপা গলায় বলল, 'বোঝো এখন! জেদটা তুমিই করেছিলে!'

অন্ধকারে সবুজ আলো দু'টি ক্রমশ এগিয়ে আসছে দেখে ধরণীকে জাপটে ধরল অশোকা।

'প্লীজ, কিছু করো!'

ধরণী কিছুই করতে পারল না। তার আগেই ক্ষিপ্রগতিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি রোমশ অনুভূতি।

যুদ্ধ

রোশনচৌকির মাথায় বাঁধা হলুদে রঙের চাঁদোয়াটা বাতাসের ভার কেটে ধপ্‌ করে মাটিতে পড়তে অলোকেশের খেয়াল হলো এতোক্ষণ ধরে যে সানাইয়ের শব্দ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উড়ে যাচ্ছিল হাওয়ায় তা আসলে তাঁর স্মৃতিতে। বাস্তবের সঙ্গে এর যোগ নেই কোনো।

বাসী বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার আগে থেকেই ওঁৎ পেতে বসেছিল ডেকরেটরের লোকজন। এখন তোড়জোড় পড়ে গেছে মেরাপ খোলার। বসার ঘর থেকে রাস্তা দেখা যায় পরিষ্কার। অলোকেশ দেখলেন, আলো এবং ডেকরেশনের বাহারে কাল রাতে, এমন কি আজ খানিক আগে পর্যন্তও যেখানে উৎসব ছিল স্পষ্ট, পর্দা-ছাড়ানো ন্যাড়া বাঁশগুলো এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এইরকমই হয়। উৎসব থেমে গেলে শব্দও থেমে যায়। আপাতত ডাস্টবিনের গায়ে এবং আশপাশে উপচে-পড়া উচ্ছিষ্টের স্তূপ ঘিরে গোটা কয়েক ভিখিরি ও দু'তিনটি কুকুর চ্যাঁচামেচি না করলে সত্যিই স্তব্ধ হয়ে যেত পৃথিবী।

সোফার ওপর শরীরটাকে যতোটা সম্ভব ছড়িয়ে দিলেন অলোকেশ। টান দিলেন চুরুটে। বাঁদিকে লম্বা সোফাটায় থমথমে মুখে বসে আছে স্ত্রী, নন্দিনী। রত্না যে সত্যিই চলে গেল বাড়ি ছেড়ে এখনো সেটা বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। চোখের দৃষ্টি রাস্তার দিকে, কিন্তু বিশেষ কোনো দৃশ্যে যে আবদ্ধ নেই তা বুঝতে ভুল হয় না কোনো। একেবারে মুখোমুখি সোফাটায় রাস্তার দিকে পিছন ফিরে বসে স্টেটস্‌ম্যান পড়ছে চন্দ্রনাথ—নন্দিনীর ছোট ভাই ও তাঁর শ্যালক; সতেরো বছর পরে লণ্ডন থেকে কলকাতায় এসেছে ভাগ্নীর বিয়ে উপলক্ষে।

অলোকেশ নন্দিনীকে দেখলেন। হঠাৎ মনে হলো, সন্তান যেভাবে যেখানেই যাক, উপলক্ষটা আনন্দের হলেও কাছছাড়া হওয়াটা মা-বাবার কাছে শোকের। নন্দিনীর মুখে তারই আভাস। স্বাভাবিক। একমাত্র মেয়েই নয়, রত্না তাদের একমাত্র সন্তান। বিয়ের বয়স হলেও আদর আহ্লাদে শিশুকাল পেরোয়নি কখনো। নন্দিনীই যেহেতু দেখত ওকে, সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখত, মেয়ে চলে যাওয়ায় ওরই কষ্ট হবে বেশি। তবে, এসব ক্ষেত্রে দুঃখটা বেশিদিন থাকে না, এই যা।

চিন্তায় বাধা পড়ল। ভিখিরিদের হাতের ঢিল খেয়ে একটা কুকুর ঢুকে পড়েছিল কম্পাউণ্ডে। এখন ওইখান থেকেই প্রতি-আক্রমণের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে তারস্বরে। বরযাত্রীর গাড়ী যাতে সটান ভিতর পর্যন্ত চলে আসতে পারে সেজন্যে গেটের পাল্লা দুটো খুলে রাখা হয়েছিল কাল। এদিকে কাজকর্ম শেষ হলে মিস্ত্রি ডেকে লাগিয়ে নিতে হবে আবার। যতোক্ষণ না তা হচ্ছে ততোক্ষণ এইসব আজে বাজে উপদ্রব সহ্য করতে হবে।

খেঁকি কুকুরটাকে তাড়ানোর জন্যে নিজেকেই উঠতে হতো হয়তো। ঠিক সেই সময়েই গোটানো লেজ খুলে আবার রাস্তার দিকে ছুটে গেল কুকুরটা।

নন্দিনী বা চন্দ্রনাথ যে এসব দেখছে, লক্ষ করছে, বিরক্ত হচ্ছে, তা মনে হলো না।

'তুমি ওভাবে বসে থাকলে কেন?' নন্দিনীকে লক্ষ করে বলল চন্দ্রনাথ, 'দু'দিন ধরে খাটাখাটনি কম যায় নি। রাতও জেগেছ সমানে। এখন একটু বিশ্রাম না করলে শরীর খারাপ হবে। যাও, চানটান করে একটু ঘুমিয়ে নাও বরং।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।' উদাসীন মুখেই উঠে দাঁড়ালো নন্দিনী, 'তোমরা কি চা-টা খাবে? পাঠিয়ে দেবো?'

চন্দ্রনাথ কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ছোড়দি। চায়ের কথাটা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। তোমাদের ওই লোকটার কী নাম

যেন ?'

'কে ? কানাই ?'

'ইয়েস, ইয়েস, কানাই। ওকেই বলো। জামাইবাবু, আপনিও খাবেন তো চা ?'

অলোকেশ বললেন, 'হচ্ছে যখন, খাই। পেটটা যদিও ভুটভাট করছে। যা একটা গেল! অনিদ্রা, অনিয়ম, সবই হয়েছে—'

নন্দিনী চলে গেল ভিতরে।

চন্দ্রনাথ এবার কাগজটা সরিয়ে রেখে অলোকেশের দিকে তাকাল।

'আপনার কিন্তু স্ট্যামিনা আছে। যেভাবে ছুটোছুটি করে সবদিক সামলালেন, কে বলবে বাষট্টি বছর বয়স হয়েছে আপনার—হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে একবার!'

'ছাখো হে—', চুরুটে টান দিয়ে একসঙ্গে অনেকটা ধোঁয়া ছাড়লেন অলোকেশ। পুরু ছাইটুকু অ্যাশট্রের গায়ে ঠুকে ঠুকে ঝেড়ে বললেন, 'অনেস্ট লোকদের স্ট্রেন্‌থ্‌ আসে ভিতর থেকে। আই ক্যান ফীল ইট; ইট্‌স্‌ সামথিং ইউনিক। ইট কাম্‌স্‌ টু পিপ্‌ল লাইক মী ওন্‌লি—'

'সে তো বটেই।' খোশামোদের গলায় বলল চন্দ্রনাথ, 'সবাই কি আর আপনার মতো পারবে ?'

চন্দ্রনাথের কথায় খুশি হলেন অলোকেশ। হাসতেই যাচ্ছিলেন; কিন্তু তখনই ভুরু কুঁচকে উঠল আবার। আগের বার কুকুর ঢুকেছিল, এবার আরও গা-জ্বালা করা ব্যাপার। দুটো ভিখিরি ঢুকে পড়েছে ভিতরে, তাদের পিছনে পিছনে এগিয়ে এলো আরও একটি। এখন তাঁদের দিকেই আঙুল তুলে কী যেন দেখাচ্ছে!

এসব এলাউ করা উচিত নয়। ভিখিরিরা হাঁটতে হাঁটতেই জন্মদান করে; কখন কীভাবে যে সংখ্যা বেড়ে যায় এদের, বুঝে ওঠা যায় না। দশ বছর আগে যখন লেক রোডের এই বাড়িটা কিনেছিলেন, তখন পাড়াটা ছিল অত্যন্ত নিরিবিলি আর সুন্দর। ভিখিরি টিখিরি বড়ো

একটা ঘেঁষতনা এদিকে। তার পরেই কেমন ওলটপালট হয়ে গেল সব! মনে মনে একটা হিসেব করে দেখেছেন, রবিবারের সকালে লেক থেকে বেড়িয়ে যখন বাড়ি ফেরেন তখন রাস্তায় চেনা অচেনা যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের প্রতি পাঁচজনের একজন ভিখিরি। তখন সত্যি সত্যিই মনে হয়, উই আর এ নেশন অফ বেগারস্।

না, এদের এলাউ করা উচিত নয়। একটু প্রশ্রয় পেলেই মাথায় চড়ে বসে।

কথার মাঝখানেই ভিখিরি তাড়াবার জন্যে উঠে পড়লেন অলোকেশ। বেশিদূর যেতে হলো না অবশ্য। দরজার কাছে তাঁকে দেখতে পেয়েই সম্ভবত দ্রুত গেটের বাইরে চলে গেল ভিখিরি তিনটি। নিজেদের মধ্যেই কিছু আলোচনা করতে করতে পিছন ফিরে তাকাল একবার। তারপর নিঃশব্দে ডাস্টবিন ঘিরে বসে গেল ডাঁই-করা এঁটো পাতা ঘাঁটতে।

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলেন অলোকেশ। চুরুটটা নিবে গিয়েছিল। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নিলেন আবার।

'হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন!'

চন্দ্রনাথের মনে পড়ল না কী বলছিলেন অলোকেশ। নন্দিনীর প্রথম দুটো চিঠির জবাব দেয় নি সে। তৃতীয় চিঠিটা ছিল অভিমানে ভরা—আর কখনো দেখা হবে না হয়তো, কারণ অলোকেশ ও তার বয়স হয়েছে, ইত্যাদি। সেন্টিমেন্টে লেগেছিল। তাই মেমসাহেব বউ আর ছেলেমেয়েদের রেখে দিন সাতেকের জন্যে একাই উড়ে এসেছিল এখানে। সাতদিনের চারদিন কেটে গেল। এখন বাকি তিনটি দিন কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচা যায়।

মনে করার চেষ্টা করে চন্দ্রনাথ বলল, 'অনেস্টিই শক্তি দেয়—'

'রাইট। সততাই শক্তি।' অলোকেশ মাথা নাড়লেন, হাসলেন অল্প। ড্রেসিং গাউনের ওপরের বোতামটা লাগাতে লাগাতে বললেন, 'তুমি আমার খাটাখাটনিটাই দেখলে। কী এনার্জি কাণ্টা হলো, কী পরিমাণ খরচ করলাম তা তো দেখলে না!'

'দেখেছি বইকি।' চন্দ্রনাথ বলল, 'যা লোক হয়েছিল কাল! অলমোস্ট সাফোকেটিং। আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছিল।'

'সে তো হবেই। তুমি তো আর এসব দেখতে অভ্যস্ত নও! বিলেতে কী হয়? বর বউকে নিয়ে যাওয়া হলো চার্চে, তারপর আত্মীয় বন্ধুদের ছোটোখাটো পার্টি ডেকে ডীনার খাওয়ানো, ওয়াইন খাওয়ানো, বীয়ার খাওয়ানো। আমিও তো ছিলাম বিলেতে। ব্যারিস্টারি পাশ করেছিলাম ওখান থেকেই। তুমি তখন কোথায়!'

চন্দ্রনাথ চুপ করে থাকল।

অলোকেশ বললেন, 'না, সাফোকেটিং লাগাটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়। আসলে কি জানো, মানুষকে ভালোবাসলে সমস্ত অসুবিধেই সহ্য করা যায়। নিজের আনন্দ যদি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে না নাও তাহলে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সার্থকতাটা কোথায়!'

পেটে লাথি খেয়েই সম্ভবত একটা কুকুর চিৎকার করছে পরিত্রাহি গলায়। ওরই সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাগ দেখাচ্ছে অন্য কুকুরগুলো।

আড়চোখে একবার খালা গেটের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন অলোকেশ। অন্যমনস্ক চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাইকোর্ট থেকে রিটায়ার করেছি চার বছর। এর মধ্যে কতো যে নতুন মুখ এসেছে প্রফেসনে! চিনিই না! তবু বার অ্যাসোসিয়েসন থেকে মেম্বারদের লিস্ট আনিয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করেছি। এ ছাড়া আত্মীয়-স্বজন, ভি-আই-পি, রত্নার বন্ধুবান্ধব—এসব তো ছিলই।'

ট্রে-তে দু'কাপ চা নিয়ে এলো কানাই। কাপ দুটো দু'জনের সামনে নামিয়ে রেখেই চলে যাচ্ছিল। অলোকেশ ডাকলেন।

'ওই গেটের মিস্ত্রিকে কখন আসতে বলেছিস?'

'সে তো বিকেলে আসবার কথা!'

'বিকেলে?' অলোকেশ ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, 'সকালেই এলে পারত। এইভাবে হাট করে রাখলে যখন তখন লোক ঢুকে পড়বে।'

'দেখি থালে। যাবো একবার।'

'হ্যাঁ, যা। ডেকরেটরের লোকজনকেও একটু তাড়া দে। জমাদারনকে আসতে বলেছিলাম সকালে, আসে নি?'

কানাই ঘাড় নাড়ল।

'ঠিক আছে, যা। কাজকর্ম তাড়াতাড়ি শেষ হলে তোরও ছুটি।'

অলোকেশের কথা শেষ হলেও কানাই নড়ল না। চায়ে চুমুক দিয়েও তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে অলোকেশ বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে!'

'বাবু, ওই ভিখিরিগুলো—'

'তার মানে!'

'কিছু খাবার চাইছিল।' কানাই একটু সাহস সঞ্চয় করে নিল। বলল, 'মিষ্টি তো অনেক বেঁচেছে, যদি এদের দু'চারটে করে দিয়ে দেওয়া যেত, লোকগুলো খুশি হতো।'

'খবরদার না!' অলোকেশ এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন যে চা চল্‌কে পড়ল কাপ থেকে। রীতিমতো রাগের গলায় বললেন, 'ভিখিরি গেলাবার জন্যে আমি বাড়িতে ভিয়েন বসাই নি!'

কথা শেষ হলো না। বাইরের দিকে চোখ পড়তেই অলোকেশ দেখলেন, ছোট, বড়ো, মাঝারি মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় জনা ত্রিশেক ভিখিরির একটি দল গেট পেরিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। বিচারকের মন, শঙ্কার আগে আগেই চলে আসে বুদ্ধি। তক্ষুণি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন অলোকেশ। এইমাত্র ঘর থেকে চলে যাওয়া কানাইকে ডাকলেন চেঁচিয়ে।

'ভিখিরিগুলোর সঙ্গে সাঁট করেছিস নাকি!'

কানাই চুপ করে থাকল।

অলোকেশ বললেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দে। আর চা-টা নিয়ে আয় ওপরে—'

উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন অলোকেশ। চুরুটের বাক্স আর দেশলাইটা হাতে নিয়ে তাকালেন চন্দ্রনাথের দিকে, 'চলো, চন্দ্রনাথ। আমরা

ওপরের বারান্দায় গিয়ে বসি।'

দোতলা বাড়ি। শোবার ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় বসলে আকাশ দেখা যায়—একতলা বাড়ির মুখোমুখি চাপা ভাবটাও চোখে লাগে না। বেশ হাওয়া। রোদে তাপ নেই তেমন। এই পরিবেশে বসলে অনেক সুরক্ষিত লাগে নিজেকে। বেতের চেয়ারে বসে অনায়াস আলস্যে গা ভাসিয়ে দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে।

আর একটা চুরুট ধরিয়ে নিলেন অলোকেশ। পাশাপাশি সাজানো ফুলের টবগুলির দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্তির আভাস ফুটে উঠল চোখে।

'গোলাপগুলো দেখেছ !'

'হ্যাঁ। সুন্দর।' চন্দ্রনাথ বলল, 'সাইজটাও রেয়ার।'

'আমার স্ত্রীর, মানে তোমার দিদির হাতে করা।'

'আচ্ছা !'

'হ্যাঁ—'

কানাই চা রেখে গেল।

'তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—।' দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চুরুটের পোড়া অংশটা খোঁচাতে খোঁচাতে অলোকেশ বললেন, 'নন্দিনীও আমার একটা স্ট্রেন্‌থ্‌। আমার যা কিছু হয়েছে তার অনেকটাই ওর জন্যে—'

চন্দ্রনাথের চোখ রাস্তার দিকে। অস্ফুটে কী বলল একটা, শুনতে পেলেন না অলোকেশ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজেও তাকালেন রাস্তার দিকে। বসার ঘর থেকে ঠিক-ঠিক বোঝা যায় নি। এখন দেখলেন, কম করেও ষাট সত্তর জন ভিখিরি জড়ো হয়েছে রাস্তায়। চার পাঁচজন তখনো ডাস্টবিন ঘাঁটছে। আশপাশে ঘুরঘুর করছে কুকুরগুলো।

অলোকেশ চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

'চা খাও, চন্দ্রনাথ। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, খাচ্ছি।'

'তোমাদের লণ্ডনে ভিখিরি কেমন ?'

'আছে।' প্রায় অন্যমনস্ক চোখে অলোকেশের মুখের দিকে তাকাল চন্দ্রনাথ। বলল, 'তবে স্ট্রে। দে আর এ ক্লাস হিয়ার।'

'যা বলেছ, একটা ক্লাস—একটা মরবিড ক্লাস! দেশটা সিভিলাইজড্ হলো না এদেরই জন্যে! আইসোর! আমি—'

কথা থেমে গেল কুকুরের চিৎকারে। অলোকেশ তাকিয়ে দেখলেন, ডাস্টবিন থেকে টেনে আনা কী একটা জিনিস নিয়ে প্রায় হস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিয়েছে একটি মেয়ে এবং একটি পুরুষ ভিখিরি। মেয়েটির কাপড় খুলে গেছে, একেবারে বেআব্রু। লজ্জার বালাই নেই কোনো। ওরই মধ্যে কোথা থেকে গালাগালি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে এলো একটি বুড়ী ভিখিরি। তারপর, ওদের তাকিয়ে থাকার মাঝখানেই, দু'দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুরু হয়ে গেল খণ্ডযুদ্ধ। কুকুরগুলোও চিৎকার করে যাচ্ছে সমানে। হঠাৎ লক্ষ করলেন অলোকেশ, রাস্তা থেকে পাথর কুড়োচ্ছে ওদেরই একজন—কোনদিকে ছুঁড়বে বোঝা যাচ্ছে না!

চুরুটটা তাড়াতাড়ি নিবিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন অলোকেশ। ভঙ্গিতে ফুটে উঠল ব্যস্ততা।

'তোমাকে বলেছিলাম না, দে আর এ ক্লাস! চলো, আমরা শোবার ঘরে গিয়ে বসি—'

চন্দ্রনাথ তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিখিরিদের লড়াই দেখছিল। অলোকেশের গলা শুনে বলল, 'শোবার ঘরে!'

'হ্যাঁ, শোবার ঘরে। এ জায়গাটা সেফ্ নয়।'

কয়েক মুহূর্ত অলোকেশের বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল চন্দ্রনাথ। তারপর হেসে বলল, 'তাই চলুন—'

সাধুচরণ

কিছুদিন থেকেই মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না সাধুচরণের। কাজকর্মে মন নেই; সারাক্ষণ অন্যমনস্ক এবং কেমন যেন উদাসীন—যেটা করার সেটা না করে যেটা না করলেও চলে সেটা নিয়ে নষ্ট করে সময়। শুধু তাই নয়। ফাঁক পেলেই বারান্দার কোণে—যেখানে রোদ পায় কিংবা হাওয়া, গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। ভঙ্গিটা এমন যেন ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা তার মাথায়। ডাকলে সাড়া দেয় না। কখনো বা বিরক্ত হয়ে বলে, 'আসছি, আসছি, এতো ব্যস্ত হবার কী আছে! একটু জিরিয়ে নিই—'

কাজের লোক এমন এলোমেলো আর উদাসীন হলে চলে না। অনিতা অনুযোগ করে, 'এভাবে চললে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে সংসার। তুমি কিছু বলো না কেন!'

মৃগাঙ্ক গম্ভীর লোক। স্ত্রীকে স্ত্রী ছাড়াও মেয়েমানুষ ভাবে। কলেজে পড়িয়ে, নোট লিখে আর পরীক্ষার খাতা দেখে যা সময় পায় তাতে অন্যদিকে মন দেবার সুযোগ কম। মাঝে মাঝে মনে হয় সংসারটা বোঝা—একবার কাঁধে নিলে ঘাড় থেকে ভূত নামানোর জো থাকে না আর। যেমন হচ্ছে এখন। আজ গ্যাস নেই, কাল ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে হবে, পরশু ছোট শালীর বিয়ের পাকা দেখা, তার পরের দিন ক্রিমি হয়েছে মেয়ের পেটে—দাঁত কিড়মিড় করে ঘুমের ঘোরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালো লাগে না। কখনো মনে হয় পার্টি আর রাজনীতি-করা জীবনটাই ছিলো ভালো। আর কিছু না হোক, আদর্শ ছিল একটা--নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরের সুখ, দুঃখ, প্রয়োজনের কথা না ভেবে ভাবা যেত বৃহত্তর এক মানবস্বার্থের কথা। মিছিলে দুরন্ত ছিল পা দুটো। স্ট্রীট কর্ণার মীটিংয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে নিজের গলা শুনে নিজেকে মনে

হতো সাধারণের ওপরে। সংসারে জড়ানোর পর আস্তে আস্তে সরে এসেছে এসব থেকে। বাধ্যই হয়েছে বলা যায়। এখন সারাক্ষণই ভ্যাদভেদে লাগে নিজেকে।

এর মধ্যে সাধুচরণকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার।

অনিতার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মৃগাঙ্ক বলে, 'পুরোনো লোক ; বয়সও হয়েছে। একটু আল্‌সে হবেই। চ্যাঁচামেচি না করে একটু বুঝিয়ে বললেই তো পারো!'

'সব ব্যাপারে ফিলজোফাইজ করা তোমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।' অনিতা বলে, 'যে-বাড়িতে পুরুষমানুষ এতো আলগা, সে-বাড়িতে ডিসিপ্লিন থাকবে না এ তো জানা কথা!'

'পছন্দ না হলে ছাড়িয়ে দিলেই পারো!'

'হ্যাঁ! তারপর তোমাদের সকলের ঝক্কি এসে পড়ুক আমার ঘাড়ে!'

গজগজ করতে করতে চলে যায় অনিতা। গায়ের ঝাল মেটায় সাধুচরণের ওপর দিয়ে।

রোজ এই অশান্তি ভালো লাগে না মৃগাঙ্কর। বিরক্ত হয়। তখন আর একটা কথাও মনে হয় তার—দোষ সাধুচরণের একার নয়। সারাক্ষণ একটা লোককে নিয়ে খিটখিট করলে শাসন থেকে তাপ যায় উবে। কথা শেষ হয় অভ্যাসে। অনিতারও বোঝা উচিত।

সেদিন সকালে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল।

ঘরে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিল মৃগাঙ্ক। হঠাৎ চ্যাঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এসে দেখল, রান্নাঘর আর কয়লা ভাঙ্গার জায়গাটার মাঝখানে ছোট বারান্দায় দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে উবু হয়ে বসে আছে সাধুচরণ। গালভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল। রোদের দিকে ফেরানো ভাঙাচোরা মুখের মধ্যে চোখ দু'টিতে দৃষ্টি নেই কোনো। রান্নাঘরের সামনে দু'হাতের মুঠো শক্ত করে দাঁড়িয়ে কী বলছিল অনিতা। মৃগাঙ্ককে দেখেই চুপ করে গেল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু'জনকে লক্ষ করল মৃগাঙ্ক। তারপর

বলল, 'কী হয়েছে ?'

'কাণ্ড দ্যাখো !' মৃগাঙ্ককে সামনে পেয়ে অনিতার জোর বেড়ে গেল আরও। বলল, 'আটটা বেজে গেল ! এখনো হাঁড়ি চড়ায়নি উনোনে ! এখন কে তোমার কলেজের ভাত দেবে, কেই বা রুনির স্কুলের ভাত দেবে ! আবার চোপা করছে মুখের ওপর ! শরীর খারাপ, বাবুর নাকি দুর্বল লাগছে—কাজ পারবে না !'

সাধুচরণ হঠাৎ বলল, 'তোমাদের শরীর খারাপ হতে পারে, আমার পারে না !'

'দেখেছ ! লাই পেয়ে পেয়ে কোথায় উঠেছে !'

মৃগাঙ্ক রাগতে শুরু করেছিল আগেই। এবার বলল, 'বুঝেসুঝে কথা বলো, সাধুচরণ। কাজ করার ইচ্ছে না থাকলে ছেড়ে দাও—'

'ঠিক আছে, ছেড়ে দেবো। ফুটপাথে গিয়ে মরব। পনেরো বছর ধরে রক্ত চুষে হাড় কালি করেছ ! আমারও আর ইচ্ছা করে না।'

'কী বললে ! রক্ত চুষেছি !' রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না মৃগাঙ্কর। সাধুচরণের কথা শুনে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। নিশ্চয়ই অন্ধ বোধ করছিল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটা লাথি ঝাড়ল সাধুচরণের পিঠে। তারপর সপ্তমে গলা তুলে বলল, 'শালা নিমকহারাম ! নিকালো—আভি নিকালো—'

লাথির চোটেই উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল লোকটা। আর উঠছে না দেখে পাশে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরল অনিতা। চোদ্দ বছরের রুনিও বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। বাবা, মা ও সাধুচরণকে জুড়ে গোটা দৃশ্যটায় চোখ রেখে আতঙ্কের গলায় বলল, 'মরে গেল নাকি !'

মৃগাঙ্ক তখনো কাঁপছিল। অনিতার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'মরতে হলে বাইরে গিয়ে মরবে। এটা ভাগাড় নয় !'

এই কথার পর দু'হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল সাধুচরণ। বাঁ হাত বাড়িয়ে কষ মুছল ঠোঁটের। উঠে দাঁড়াল। ডান দিকের কপালে

ছেঁচে গেছে এক ইঞ্চি মতো জায়গা। সেখানে রক্তের আভাস। নাকে আঘাত লাগার জন্যেই সম্ভবত জল গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে। থুথু ফেলল মাটিতে। তারপর মৃগাঙ্ক ও অনিতার দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে বলল, 'না বাবু। এখানে মরব না।'

ওরা দেখল, হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁটের কষ মুছতে মুছতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে যাচ্ছে সাধুচরণ। ছিটকিনি খুলল দরজার। আর কোনো কথা না বলে—এমনকি পিছনেও না তাকিয়ে, চলে গেল।

সাধুচরণ মরে বেরোলে এর চেয়ে বেশি স্তব্ধতা নামত না। এবং তা নামল অন্য কোনো ভূমিকা না করে।

অনিতা তাকিয়ে ছিল খোলা দরজার দিকে। পাশ দিয়ে হেঁটে মৃগাঙ্ক ঘরে ঢুকছে দেখে বলল, 'দরজাটা লাগবে না?'

মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার অনিতার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। উঁকি দিয়ে দেখে নিল বাইরেটা। তারপর দরজায় ছিটকিনি, এমনকি খিল তুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল স্ত্রীর দিকে।

'হয়েছে শান্তি!'

'আমাকে বলছ কেন! আমি কি ওকে চলে যেতে বলেছিলাম!'

'না, আমিই বলেছিলাম!'

মৃগাঙ্কর রাগ পড়েনি। এমনও হতে পারে সাধুচরণ চলে যাওয়ায় ক্ষেপে গেছে আরও। এখন চোটপাট করবে তারই ওপর। কথায় কথা বাড়ে। যা ঘটবার ঘটে গেছে; এরপর ঘটনাটা নিয়ে বেশি রগড়া-রগড়ি করলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার দায়ে আগুন লেগে যেতে পারে গোটা সংসারে। যেভাবে লাথিটা মারল এবং উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, তাতে আরও বড়ো কোনো কেলেঙ্কারি যে ঘটেনি তাই রক্ষে। লোকটা মরে গেলে এক্ষুনি খুনের দায়ে পড়ত মৃগাঙ্ক। এইসব ভাবনায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো অনিতার; গা গুলোতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা চিন্তাও খুঁড়তে লাগল তাকে। কোনো প্রতিবাদ না করে

চুপচাপ যেভাবে চলে গেল সাধুচরণ তাতে আবার লোকজন জড়ো করে ফিরে আসবে না তো!

রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপিয়ে দিল অনিতা।

গ্যাসের উনুনে ভাত ছাড়ার জন্যে ডেকচিতে জল ফুটতে দিয়েছিল সাধুচরণ, চাল ধুয়ে সরিয়ে রেখেছিল বাটিতে। কিছুই যে করে রাখে নি তা নয়। ভাত হয়ে গেলে দরকার হতো ডাল আর মাছ ভাজার। গত রাতে ডাল বাড়তি হয়েছিল বলে তুলে রাখা হয়েছিল ফ্রীজে—সেটাই গরম করে নেওয়ার কথা। তারপর থাকে মাছ ভাজা। তেল-নুন-হলুদ মাখিয়ে কড়ায় ছাড়তে কতোক্ষণই আর লাগত! আসলে, অনিতা ভাবল, রাগটা সে দেখিয়েছিল লোকটাকে ওইভাবে উদাসীন, রোদের মধ্যে বসে থাকতে দেখে। কিছুটা অভ্যাসেও হয়তো। এরকম ঘটনা আকছার ঘটেছে। তার মানে এই নয় যে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে আসবে এবং লাথি মারবে! হয়তো সত্যি সত্যিই অসুস্থ ছিল লোকটা। মাস দেড় দুইয়ের মধ্যে হঠাৎই একসঙ্গে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল অনেকটা, চোখমুখ বসে গিয়েছিল, কথাবার্তা বলতই না প্রায়; সুযোগ পেলেই রোদ খুঁজত। চোপা আজই করেছিল। তারপর যা ঘটল ভাবলে কাঁটা দেয় গায়ে।

চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে অনিতা দেখল কুঁজো হয়ে বসে খাতা দেখছে মৃগাঙ্ক। অনিতার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল আবার।

অনিতা একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'কখন বেরোবে?'

'কেন!'

'আধঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। তোমার ভাত পাবার অসুবিধে হবে না।'

মৃগাঙ্ক ঘুরে বসল।

'কাজ দেখাচ্ছ?'

অনিতা নরম হয়ে এসেছিল। মৃগাঙ্কর কথার শ্লেষটুকু ধরতে পেরে তেতে উঠল।

'অতো খোঁচা দিয়ে কথা বলার দরকার নেই কোনো!'

'খোঁচা খাবার হলে ঠিকই খাবে।' মৃগাঙ্ক বলল, 'সাতসকালে অশান্তি; পান থেকে চুন খসলেই চ্যাঁচামেচি! তুমি যা ব্যবহার করো তাতে কোনো লোকই টিঁকবে না।'

অনিতা গুটিয়ে নিল নিজেকে। মৃগাঙ্কর গলায় ঝাঁঝ আছে, জোর নেই কোনো। যুক্তি দিয়ে নিজেকে দাঁড় করাতে পারছে না বলেই এইসব পাশ কাটানো অজুহাত। খানিক চুপ করে থেকে ওখান থেকে সরে যাবার আগে বলল, 'লাথিটা না মারলেই পারতে।'

মৃগাঙ্ক জবাব দিল না। বাবা মা'র কথার মাঝখানে ও ঘর থেকে এ-ঘরে চলে এসেছিল রুনি, সম্ভবত আর একটি দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। চোখমুখ থমকানো। দু'জনেই চুপ করে গেছে দেখে বলল, 'আমি গিয়ে দেখব সাধুদা কোথায় গেল?'

মৃগাঙ্ক জানলার দিকে তাকাল। আব্রু রাখার জন্যে তলার ফ্রেম থেকে তিন ফুট পর্দা লাগিয়েছে অনিতা। রাস্তা দেখা যায় না। সাধুচরণ যাবার পর কেটে গেছে পনেরো মিনিটেরও বেশি। অনেকটা সময়। এর মধ্যে দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে, ক্রোধ বাড়া কিংবা কমা। অন্যমনস্ক-ভাবে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে শেষের সম্ভাবনাটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল মৃগাঙ্ক। তেমন কোনো মতলব থাকলে এরই মধ্যে ফিরে আসত লোকটা। একটু খাপছাড়া স্বভাবের মানুষ ছিল সাধুচরণ, কিছুবা আত্মভোলা। অনিতা বা রুনি ওকে দেখবার অনেক আগে থেকেই দেখছে মৃগাঙ্ক। পার্টি অফিসের লাগোয়া ছোট রেস্তোরাঁয় ফাইফরমাশ খাটত। রুনির জন্মের আগে মৃগাঙ্কই ডেকে এনেছিল বাড়িতে। চব্বিশ ঘণ্টার লোক। এই বাড়িতেই জোয়ান থেকে এগোচ্ছিল ক্রমশ বুড়ো হওয়ার দিকে—যদিও বয়স কতো কোনোদিনই ঠিক ঠিক ধরতে পারেনি মৃগাঙ্ক। আজ সকালে ওর রোদ-পড়া শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বারেকের জন্যে মনে হয়েছিল বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা। তখনো লাথি মারার প্রয়োজন হয় নি।

টেবিলের তলায় হাত বাড়িয়ে যে-পায়ে লাথি মেরেছিল সেই পায়ের হাঁটুতে হাত বুলিয়ে অস্বস্তি কাটাতে চাইল মৃগাঙ্ক। পিছনে না তাকিয়েও বোঝা যায় অনিতা তখনো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। তখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখার দরকার নেই। তিন কুলে একা, যাবে কোথায়!'

'সাধুদার অসুখ ছিল।' রুনি সেই জায়গাটায় দাঁড়াল, যেখান থেকে মৃগাঙ্ক ও অনিতার দূরত্ব সমান। বলল, 'পেটে জ্বালা করে, সারাক্ষণ মাথা ঘোরে—কাল বলেছিল আমাকে—'

কথাগুলো মৃগাঙ্ক বা অনিতা কার উদ্দেশ্যে বলা, দু'জনের কেউই তা বুঝতে পারল না। সুতরাং পরস্পরের দিকে তাকিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল তারা।

তখন তিনজনেরই স্তব্ধতা চিনে নেওয়ার সময়। জায়গা থেকে সরে যাবার আগে অনিতা বলল, 'রুনি, তুই আজ স্কুলে যাবি না। আমি একা থাকতে পারব না।'

সাধুচরণ ফিরল না।

কোনোরকমে নাকে মুখে গুঁজে কলেজে বেরুবার আগে শেষ যেখানে বসে ছিল সাধুচরণ সেখানটায় তাকিয়ে মৃগাঙ্ক লক্ষ করল রোদ সরে গেছে; উঠোনের শ্যাওলায় রঙ ধরেছে কালো। নির্দিষ্ট কিছু মনে পড়ল না। ঘড়িতে সময় দেখে অনিতাকে বলল, 'কোনো দরকার থাকলে ফোন কোরো। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।'

মৃগাঙ্কর পিছনে পিছনে দরজা লাগাতে গিয়ে মা ও মেয়ে দু'জনেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। রাস্তা ও রাস্তার অনুষঙ্গ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। সম্ভবত মৃগাঙ্ক কখন ঘুরে গেল বড়ো রাস্তার দিকে, তাও নয়।

দরজা বন্ধ করতে করতে অনিতা বলল, 'আজ মাসের আঠারো তারিখ। আঠারো দিনের মাইনে নিতেও ফিরে আসবে নিশ্চয়ই—'

রুনি অনিতাকে দেখল। যা বলতে যাচ্ছিল তা বলার আগেই

ঠোঁট কেঁপে গেল অল্প। তারপর বলল, 'বিছানাটা না হয় আমরা দিয়েছিলাম। জামা কাপড়গুলো তো ওরই। ওগুলো নিতেও—'

মেয়েকে থেমে যেতে দেখে অনিতা নিজেও থেমে গেল। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর কী মনে হয়?'

রুনি জবাব দিল না। ঘরের দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'আমি বাথরুমে ঢুকছি। কেউ ডাকলে দরজা খুলো না। আমি খুলব।'

সাধুচরণ ফিরল না।

দুপুর নাগাদ বাসনের ফেরিওলার হাঁক রাস্তার শেষ প্রান্তে মিলিয়ে যাবার পর বেল পড়ল দরজায়। অনিতা ও রুনি পাশাপাশি শুয়েছিল বিছানায়। অল্প তন্দ্রার মতো এসেছিল অনিতার; সুতরাং আওয়াজটা রুনিই শুনল আগে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। তার পরে অনিতাও। মেয়ের হাত চেপে ধরে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'শুনলে তো বেল বাজছে!'

রুনিকে ব্যস্ত হতে দেখে অনিতা বলল, 'যাবি! আগে দেখে নিলে হতো না!'

'দেখার মতো দশটা জায়গা থাকলে দেখা যেত।' রুনি বলল, 'এতো যাদের ভয় তারা এমন কাণ্ড করে কেন!'

বসার ঘরে একটা জানলা আছে, সেটা সদরের দিকে নয়। থাকলে নিরাপত্তা বাড়ত। অভাবে ম্যাজিক আই যতোটুকু দেখায় তার বেশি দেখা যায় না কিছু। বেশি রাতে কেউ এলে 'কে' 'কে' করতে হয়। জবাব পেলে গলার স্বর বুঝে যেটুকু চেনা যাবার যায়, না হলে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না কোনো। এই মুহূর্তে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই মেয়েকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে চোখে রাত দেখল অনিতা; টিপ টিপ করতে লাগল বুক—ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সেই বিস্ফোরক মুহূর্তটির জন্যে।

যা ভেবেছিল তাই। দরজা খুলেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রুনি, 'মা, সাধুদা!'

সাধুচরণ একা নয়। সঙ্গে জনা চারেক বিভিন্ন বয়স ও চেহারার লোক। ওদের কাউকেই গুণ্ডা বা মাস্তান বলে মনে হলো না। তখন নিঃশ্বাস ছেড়ে রুনির পাশে গিয়ে দাঁড়াল অনিতা এবং দেখল, পিছনের দু'টি লোকের কাঁধে দু'হাতের ভর দিয়ে যীশুখৃষ্টের ধরনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধুচরণ। চোখদুটো বন্ধই বলা যায়, কাঁধ-ছেঁড়া ও দোমড়ানো হাল্কা নীল জামায় ছড়ানো ছিটানো রক্তের দাগ, ধুতিটা এলোমেলো হয়ে লুটোচ্ছে রাস্তায়।

যে-লোকটি সামনে দাঁড়িয়েছিল, অনিতা ও রুনির দিকে তাকিয়ে সেই কথা বলল প্রথম।

'এ আপনাদের লোক?'

বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়ল রুনি।

'বাজারের সামনে বসে রক্তবমি করছিল।' লোকটি বলল, 'ঠিকানা বলতে নিয়ে এলাম—'

ওরা চুপ করে থাকল।

'আপনাদের লোক এমন অসুস্থ জানতেন না!'

'কী করে জানব!' রক্তবমি শুনেই অনিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সাধুচরণের এই অবস্থায় তার পক্ষে যে-কোনো অজুহাত দেখানো সম্ভব, প্রতিবাদ হবে না। তবু কথাগুলো বলার আগে মেয়ের মুখে সম্মতি খুঁজল। তারপর বলল, 'বাজারে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছিল। ফেরার নাম নেই দেখে আমরাও ভাবছিলাম। আগে তো কখনো এমন হয় নি!'

বলার পরই অনিতা বুঝতে পারল লোকগুলি তার কথায় বিশ্বাস করেছে। সাধুচরণের ভঙ্গীতেও কোনো পরিবর্তন নেই দেখে ও সাহস পেল আরও। বলল, 'ওকে ভিতরে নিয়ে আসুন—'

'যাও হে, ভিতরে নিয়ে যাও—'

অনিতা ও রুনি সরে দাঁড়াতে ধরাধরি করে সাধুচরণকে ঘরের ভিতরে এনে বসিয়ে দিল পিছনের লোক দু'টি। তারপর আবার বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে। প্রথম লোকটি, যে তখনো দাঁড়িয়েছিল ফুটপাথে,

অনিতার চোখের দিকে তাকাতেই বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে উঠল অনিতার। দৃষ্টিটা চেনা। সন্দেহ। মুখ আড়াল করার জন্যে আলগোছে আঁচলটা টেনে গলা মুছবার চেষ্টা করল অনিতা। পা দু'টি সামনে ছড়ানো, পিছনে ছড়ানো হাত দু'টির দিকে মাথা ঠেলে দিয়ে সাধুচরণ তখন ধুঁকছে। লোকটি বলল, 'কেস্ খারাপ। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখান—'

লোকগুলি চলে যাচ্ছে দেখে প্রথম সুযোগেই দরজাটা বন্ধ করে দিল অনিতা। বন্ধ দরজার পিঠে ঠেস দিয়ে হাঁফ-ধরা গলায় বলল, 'রুনি, দ্যাখ কী হয়েছে!'

'শুনলে তো রক্তবমি করছিল!' ঈষৎ বিরক্ত গলায় কথাগুলো বলে হাঁটু গেড়ে সাধুচরণের পাশে বসে পড়ল রুনি। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'সাধুদা, কী হয়েছে!'

একবার এপাশে একবার ওপাশে মাথা নাড়িয়ে কী বলবার চেষ্টা করল সাধুচরণ, বোঝা গেল না কিছুই। তখন অনিতাও ঝুঁকে এলো ওর সামনে।

'আশ্চর্য! কী হয়েছে বলবে তো!'

তখনই একটা কাণ্ড করে ফেলল সাধুচরণ। গোটা শরীরটা অনিতার সামনে মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে কেঁদে উঠল ডুকরে, 'শরীরে বড়ো কষ্ট মা! এখানেই মরতে দাও আমাকে—'

অনিতা নিজেকে সরিয়ে নিল।

'আচ্ছা নাটক শুরু করল দেখছি! কী করা যায় বল তো!'

'আগে ওকে শোয়াই তো!' রুনি বলল, 'নাটক-নাটক করছ কেন! নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছে! সত্যি কথা জানলে ওই লোকগুলো আজ আমাদের ছেড়ে দিত না।'

'সেটা তোর বাবাকে বলিস।'

গলায় ঝাঁঝ ফুটলেও সাধুচরণকে তুলে ধরবার জন্যে মেয়ের পাশাপাশি এসে দাঁড়াল অনিতা। রান্নাঘরের পাশে পার্টিশনের আড়াল-

দেওয়া সাধুচরণের শোবার জায়গায় তক্তপোষের ওপর ওকে শুইয়ে দিয়ে তেলচিটে বালিশটা ঠিকঠাক করে গুঁজে দিল মাথার নিচে।

এবার সত্যিই আঁচল তুলে ঘাড়, গলা মুছবার দরকার হলো অনিতার।

'রুনি, তোর বাবাকে একটা ফোন করবি নাকি ? যদি ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে হয় !'

'তুমি করো।'

'তাহলে তুই এখানে থাক। একটু দুধটুধ খায় কি না দ্যাখ, যদি চাঙ্গা হয় কিছুটা।'

অনিতা চলে এলো। ব্যস্তভাবে টেলিফোনের রিসিভার তুলে মৃগাঙ্কর কলেজের নাম্বার ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবল, যদি কিছু হয়ে থাকে, তার সঙ্গে আজকের সকালের ঘটনার সম্পর্ক নেই কোনো। যদি এমন হয় যে সাধুচরণের এই অবস্থার জন্যে আজকের সকালের ঘটনাই দায়ী, তাহলেও তার নিজের দায়িত্ব থাকছে না কিছু। লোকটার সঙ্গে কাজ নিয়ে খিটিমিটি আজই প্রথম লাগেনি। লাগত, মিটেও যেত। আজকের ঘটনার সঙ্গে বাড়তি জড়িয়ে আছে মৃগাঙ্কর লাথি মারা। দায় মৃগাঙ্কর। রেগে গেলে হিতাহিত ভুলে যায় লোকটা। এইভাবে কোনোদিন তাকেও লাথি মারতে পারে।

মৃগাঙ্ককে পাবার পর অনিতা বলল, 'শোনো, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো।'

'কেন !'

'সাধুচরণ ফিরে এসেছে—'

'কখন !'

'এই তো খানিক আগে। তবে অবস্থা ভালো নয়।'

'তার মানে !'

'বাজারের সামনে বসে রক্তবমি করছিল। কয়েকজন লোক এসে পৌঁছে দিল বাড়িতে—'

'সে কী!'

অনিতা চুপ করে থাকল। মৃগাঙ্কও। তারপর মৃগাঙ্ক বলল, 'লোক-গুলো কিছু বলল?'

'কী বলবে!'

'ওই লাথি মারার ঘটনাটা! বলেছে নাকি?'

'না। সেসব বলে নি।'

মৃগাঙ্ক চুপ করে গেল। একটু থেমে বলল, 'ঠিক আছে, আমি আসছি—'

অনিতা বলল, 'একজন ডাক্তারও নিয়ে এসো—'

'দেখছি।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে খানিক দিশেহারা চোখে শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল অনিতা। তারপর ভাবল, বমি করতে করতে কেউ কিছু জানবার আগেই রাস্তায় মরে পড়ে থাকলে এই ঝক্কি পোহাতে হতো না। মৃগাঙ্ক লাথির ব্যাপারটা নিয়েই চিন্তিত, জ্বালার কথাটা ভাবছে না। এখন কতোদিন ভোগাবে তার ঠিক কী! তবে এটা ঠিক, সেরে উঠলেও এই লোককে আর রাখা যাবে না বাড়িতে। রক্তের রোগ অনেক সময় ছোঁয়াচেও হয়।

ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা কতোদূর গড়ালো তা দেখতে গেল অনিতা।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যখন বাড়িতে এলো মৃগাঙ্ক তখন ছায়া নামতে শুরু করেছে। সাধুচরণও কিছুটা চাঙ্গা। ওকে দেখতে দেখতে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস চাপল মৃগাঙ্ক। ইশারায় অনিতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছিল ডাক্তারকে বলবার দরকার নেই কোনো।'

'যদি ও বলে!'

'ও বলবে না।' মৃগাঙ্ক বলল, 'আঠারো কুড়ি বছর ধরে দেখছি, লোকটা বেইমান নয়। তা ছাড়া, বাঁচতে হলে এখন ওর বেইমানি করা

চলবে না।'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করল ওরা। তারপর ফিরে এলো নিঃশব্দে।

'ভালো নয়।' দেখেশুনে ডাক্তার বললেন, 'সিম্‌পটম দেখে মনে হচ্ছে খারাপ ধরনের আলসার। একটা ইঞ্জেকসন দিয়ে যাচ্ছি, ওষুধও। যদি তারপরেও বমি করে—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়ল। বিমর্ষ মুখে অনিতাও।

সেদিন অনেক রাতে সাধুচরণের রোগপাণ্ডুর মুখের কাছে ঠাণ্ডা দুধের বাটি তুলে ধরে মৃগাঙ্ক বলল, 'ভয় পেও না, সাধুচরণ। ভালো হয়ে যাবে—'

'ভালো আর কী হবো, বাবু!' সঙ্কুচিত গলায় সাধুচরণ বলল, 'নিখাকি রোগ। দেশগাঁয়ে দেখেছি অনেক লোক এই রোগে মরে—'

মৃগাঙ্ক অনিতার দিকে তাকাল, তারপর পার্টিশনের বাইরে দাঁড়ানো রুনির দিকে। ঈষৎ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'যত্নে সবাই ভালো হয়। তুমিও হবে। কাল সকালে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো। সেখানে বড়ো ডাক্তার আছে—'

সাধুচরণ জবাব দিল না। শীর্ণ মুখের মধ্যে জ্বলজ্বলে দু'টি চোখ; এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মৃগাঙ্কর দিকে। তারপর হঠাৎ ভাঙাচোরা গলায় বলল, 'লাথিটা আগে মারলেন না কেন, বাবু! রোগটা আগে ধরা পড়লে হয়তো বেঁচে যেতাম!'

নিত্যগোপালের পুত্রলাভ

লটারির ভাগ্য বরাবরই খারাপ নিত্যগোপালের। যৌবনে পৌঁছে কেঁদে কঁকিয়ে বি-কম এবং তার পরে কস্ট্ একাউন্টেন্সি পাশ করে নন্দী কেমিক্যালস লিমিটেডে অ্যাসিস্টান্ট পারচেজ অফিসারের পাকাপোক্ত চাকরিতে ঢোকবার অনেক আগে থেকেই লটারি ব্যাপারটা টানত তাকে। জানত, সোজা রাস্তায় উপার্জন করে ও বড়লোক হয়ে বাড়িগাড়ি করবার জন্যে যে বিদ্যেবুদ্ধি ও যোগ্যতা দরকার, সেগুলি তার নেই—হবেও না কোনোদিন। যে-পরিবারে তার জন্ম সেখানে লেখাপড়া ব্যাপারটা ছিল ভুডু। নিত্যগোপালের বাবা সাক্ষীগোপাল রোড কন্ট্রাকটরি করে কিছু পয়সা কামিয়ে যখন থিতু হবার কথা ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে মারা গেল স্ট্রোকে। কাকাদের একজন বডি-বিলডার হিসাবে নাম করেছিল; অন্যান্যরা কী করত এবং সংসার চালাতো কী-ভাবে, কোনোদিনই তার হদিশ পায়নি নিত্যগোপাল। মামাবাড়ির ছিল মাছের ভেড়ি। মাঝে মধ্যে রুইটা, কাতলাটা পাঠিয়ে সম্পর্কটা জিইয়ে রাখত তারা।

পারিবারিক এই ব্যাকগ্রাউণ্ড একটু বয়স হবার পরই ঠিক-ঠিক জেনে নিয়েছিল নিত্যগোপাল। কমবেশি দুঃখও যে পায়নি তা নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাচ্ছিল সে তা ভাগ্যেরই জোরে। ভাবত, একদিন না একদিন ভাগ্যই তাকে পাইয়ে দেবে লটারি। টিকিটও কিনত নিয়মিত। কিন্তু, এ-পর্যন্ত অন্তত ভাগ্য সহায় হয় নি তার—আশপাশের নাম্বারগুলো ছুঁয়ে প্রতিবারই পাশ কাটিয়ে গেছে তাকে।

সুতরাং, সল্ট লেকে সরকারী জমি কিনতে পাওয়া যাবে লটারির ভিত্তিতে, খবরের কাগজে এরকম একটা বিজ্ঞপ্তি দেখার পর জমি ও বাড়ির লোভে নাইকুণ্ডুলিতে সুড়সুড়ি লাগলেও, নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে

ফর্ম নিয়ে, ভর্তি করে, অ্যাপ্লিকেসনটা জমা দেবার সময় মনে কোনোরকম আতিশয্য বোধ করেনি সে। লটারিতে নাম উঠলে দু' তিন কিস্তিতে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা ক্যাশডাউন করতে হবে—বউয়ের গয়নাগাটি বেচেও অতো টাকার সংস্থান করা যাবে না—বাড়ি তোলা তো দূরের কথা, এসব ভেবেও যে সে দরখাস্ত করার কথা ভাবল, তার মূলেও ছিল এক-রকম হতাশাবোধ এবং নিজের সঙ্গে খেলা। জানেই তো নাম উঠবে না! তবে ফর্ম-টর্ম কেনা ও জমা দেওয়া বাবদ কিছু টাকা জলে গেল—এই যা।

কাউকে কিছু না জানিয়ে একা-একাই এই কাজগুলো করতে করতে একরকম দুঃখে চুপচাপ হয়ে গেল নিত্যগোপাল। ভাবল, পাবো না বা হবে না জেনেও কি সত্যিই কেউ কিছু করে! চাকরিটা করে কী জন্যে? বাধ্যতামূলকভাবে? নাকি মাস গেলে কিছু টাকা আসবে হাতে, খাওয়া পরার প্রয়োজনগুলো মেটাবার পরও উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে কিনতে পারবে বাড়তি কিছু সুখ সুবিধে? এইসব সুখ সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্যের ধারণা নিয়ে একটা পরিকল্পনা আছে নিত্যগোপালের মনে। বিয়ের পর থেকেই, অর্থাৎ গত আট বছর ধরে, স্ত্রী মণিদীপার সঙ্গে এই নিয়ে নানারকম আলোচনা হয় তার। পরিকল্পনাটাই চালায়। লটারির কপাল খারাপ হলেও বাড়ি করার স্বপ্নটা মিথ্যে নয়। কিউয়ে দাঁড়িয়ে, অ্যাপ্লিকেসন জমা দিয়ে, সিরিয়াল নাম্বার লেখা রসিদটা হাতে নিয়ে, নাম্বারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, মানিব্যাগে সাবধানে ভরতে ভরতে অফিসে ফেরার পথে ঈষৎ অন্যমনস্ক নিত্যগোপাল ঢুকে পড়ে তার সংকল্পের বাড়িতে। নাকে লাগে নতুন চুন সিমেন্টের গন্ধ। এইভাবে, অফিসের চেয়ারে বসে ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে।

খানিক পরে ডাক পড়ে পারচেজ অফিসারের ঘরে।

যোগেন বিশ্বাস খোলামেলা লোক। কথা বলে গালে টোল ফুটিয়ে, রাগ বিরক্তি নেই কোনো। ঝাঁপা, বড়োসড়ো চেহারার জন্যে ছোট কেবিনটা ছোট মনে হয় আরও। নিত্যগোপাল টের পেল তার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটাও ঢুকে পড়েছে যোগেনের ঘরে।

'কী ব্যাপার হে। অফিসে এসেই বেপাত্তা হয়ে গেলে!'

'একটু কাজ ছিল। পার্সোনাল।'

'পার্সোনাল কাজ!' সোজাসুজি নিত্যগোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো প্রশ্ন চেপে গেল যোগেন বিশ্বাস। তারপর বলল, 'কপিয়ারের পেমেন্ট নিতে দাশ কোম্পানীর সেই ছোকরা আজ আসবে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। এলেই চেকটা বের করে দিও না। আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—'

নিত্যগোপাল মাথা নাড়ল।

'বউমার জন্যে একটা প্রেজেনটেসন আছে—।' যোগেন বিশ্বাস হঠাৎ ড্রয়ার টেনে একটা ফাউন্টেন পেন বের করে বাড়িয়ে ধরল নিত্য-গোপালের দিকে। বলল, 'লেডিজ পার্কার, গোল্ড নিব। বউমাকে দিও, খুশি হবে—।'

ছ' বছর পারচেজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে করতে প্রশ্নহীনভাবে কিছু-কিছু গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে নিত্যগোপাল। জানে, যোগেন বিশ্বাস একা খায় না। পেনটা পকেটে গুঁজে নিয়ে চলে যাবে কি না ভাবতে ভাবতে বলে ফেলল, 'যোগেনদা, জমি বাড়ি করার জন্যে অফিস থেকে লোনটোন পাওয়া যায় কিছু?'

'লোন! কে নেবে?'

'মানে—', মেজাজ আঁচ করে পকেট থেকে খবর-কাগজের কাটিংটা বের করে যোগেনের দিকে এগিয়ে দিল নিত্যগোপাল। চোখ বোলানোর সময় দিয়ে বলল, 'অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে এলাম আজ। লটারির ব্যাপার, উঠবে না বলেই মনে হয়। তবে—'

'অনেক টাকা জমিয়েছ?'

'না, মানে—' নিত্যগোপাল বলল, 'যদি অফিস থেকে লোনটোন পাওয়া যেত! জানেনই তো, যে-রেটে জমিজমার দাম বাড়ছে—যদি জমিটাও কিনে রাখা যেত—'

'কতো জমিয়েছ?'

'কতো আর। হাজার পনেরো হবে—'

'হুঁ!' যোগেন বিশ্বাস গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'প্রাইভেট কোম্পানী, সবই বসের মরজির ওপর। আইন-কানুন তো নেই। চেষ্টা চরিত্র করে না হয় হাজার দশেক দেয়া গেল। তারপর?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল নিত্যগোপাল। বলল, 'লটারি তো! উঠবে না বলেই মনে হয়।'

'যদি ওঠে?'

নিত্যগোপাল চুপ করে আছে দেখে যোগেন বলল, 'এসব কোম্পানীতে এই বয়সে ঘুষের টাকায় বাড়ি হয় না। তেইশ বছরের সারভিসে আমি মোটে পাঁচ কাঠা বানিয়েছি। একতলা উঠেই থেমে আছে বাড়িটা। মেয়ের বিয়ে দিতে এক কাঁড়ি টাকা গেল। খুবই রিস্কি প্রোপোজাল। যদি ওঠে?'

নিত্যগোপালও একই কথা ভাবল এবং চুপ করে থাকল।

'বউমার সঙ্গে পরামর্শ করেছ?'

'না। ও কিছুই জানে না।' নিত্যগোপাল বলল, বললেই স্বপ্ন দেখবে। তারপর যদি না ওঠে, স্বপ্নটা ভেঙে যাবে—'

'যদি ওঠে?' সময় নিয়ে যোগেন বিশ্বাস বলল, 'স্ত্রী বসুন্ধরা। তার অজ্ঞাতে জমিজমা হয় না। এক ছাদের নিচে আছো, একই বিছানায় শোও। না হয় দুঃখটাও ভাগাভাগি করবে। এটা ঠিক করো নি।'

সেদিন যতোক্ষণ অফিসে থাকল কয়েকবারই অ্যাপ্লিকেসন জমা দেওয়া রসিদটা মানিব্যাগ থেকে বের করে চোখ বোলালো নিত্যগোপাল এবং বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবল, স্ত্রী বসুন্ধরা, তার অজ্ঞাতে জমিজমা হয় না। হয়তো দরখাস্ত করার আগে জানানো উচিত ছিল মণিদীপাকে। জমি বা বাড়ি যদি সত্যি সত্যিই না হয়ে ওঠে, তাহলেও দুঃখটা তারা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। তার পরেই ভাবল, মণিদীপাকে কি সে সবকিছু জানায়? কিংবা মণিদীপা তাকে? এক ছাদের নিচে থাকলেও এবং একই বিছানায় শুলেও সে ও মণিদীপা কি একই মানুষ? প্রশ্নগুলো

একটু এলোমেলো করে দিল তাকে।

জের চলল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। যতো না ভাবল মনে মনে তার চেয়ে বেশি পরিকল্পনা আঁটল নিত্যগোপাল। তার সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট তথ্য, যে-কোনো ঘটনা ঘটবার আগেই ফলাফলটা আন্দাজ করে নেয় সে এবং যদি এমন হয় যে ঘটনা ঘটল এবং ফলটা তার বিপক্ষে গেল, তা হলে, আগেই তা অনুমান করে, সময় থাকতে থাকতেই গড়ে নেয় একটা আত্মরক্ষার দেয়াল। সে ও মণিদীপা দু'জন লোক—সংসার ও জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত তাদের সুখ কিংবা দুঃখের চেহারা একইরকম হলেও, এগুলির অনুভব শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে যেতে পারে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা দিকে। আট বছর বিয়ে হলেও এবং নিয়মিত ও অবাধ যৌন সংসর্গ করলেও এ পর্যন্ত ছেলেপুলে হয় নি। এটা তাদের দুঃখের জায়গা—ক্রমশ অতৃপ্তিরও। অসুবিধেটা কি জানবার জন্যে বছর চারেক আগে একদা তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছিল। এক সঙ্গে চেক-আপ করালেও ফল জানতে একাই গিয়েছিল নিত্যগোপাল ; ভেবেছিল, যদি কোনো গণ্ডগোল থাকে, মণিদীপা জানতে পারলে আপসেট হবে। তাতে তাদের অতৃপ্তি বাড়বে, টেনসন বাড়বে। কী লাভ!

যাই হোক, পরে ডাক্তারের সঙ্গে তার এইরকম কথাবার্তা হয়—

'আপনার স্ত্রীর দিক থেকে কোনো অসুবিধে আছে বলে মনে হয় না। তবে—'

'আমার ?'

'একটা ডেফিসিয়েন্সি আছে বলে মনে হচ্ছে। কিছু ওষুধপত্র খান। সেরেও যেতে পারে—'

ঠিক এই কথাটির পরেই নিত্যগোপাল বুঝে নেয় সন্তানশূন্যতার দুঃখজনিত কারণে তার ও মণিদীপার ভূমিকা কোনখানে। তখনই, আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেয়। মানিব্যাগ থেকে ডাক্তারের ফী বাবদ চৌষট্টি টাকা বের করতে গিয়েও বাড়তি একটি একশো টাকার নোট বের করে ডাক্তারের হাতে গুঁজে দেয় নিত্যগোপাল—আলাদা আলাদাভাবে।

অবাক হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'এতো কেন!'

'আমার স্ত্রী যেন ব্যাপারটা জানতে না পারে—'

'সিক্রেসি মেনটেন করার দায়িত্ব আমার! এর জন্যে ঘুষ দিতে হবে না। আপনি ওষুধগুলো খেয়ে যান নিয়মিত। ছ' মাস পরে আবার আসবেন—'

'এরকম অনেক মেয়েরই হয়। ইউট্যারাস ছোট—।' সেদিন ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে মণিদীপাকে বলেছিল নিত্যগোপাল, 'বিয়ের কুড়ি বছর পরেও প্রথম বাচ্চা হয়েছে এরকম অনেক কেস আছে। ডাক্তার বলেছে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার বয়েস মোটে সাতাশ। এটা টাইমের ব্যাপার। অনেক টাইম আছে—'

শুনে, অল্প ঘাবড়ে-যাওয়া মুখ করে মণিদীপা বলেছিল, 'তাই বলো, আমারই দোষ!'

'দোষ ভাবাটাই দোষের। আমি এটাকে দোষ ভাবি না।' নিজের তাৎক্ষণিক সাফল্য আড়াল করে নিত্যগোপাল বলেছিল, 'তাছাড়া ছেলে-পুলে যতো দেরিতে হয় ততোই ভালো। হলেই তো রাজ্যের খরচ! সবে টাকার মুখ দেখতে শুরু করেছি, এখন ছেলেপুলে হওয়া মানেই সুখ সুবিধেয় টান পড়া—'

নিত্যগোপাল সম্পর্কে আর একটি তথ্য, ইচ্ছে করলেই গলায় সহানুভূতি ফোটাতে পারে সে।

চুপচাপ গলায় মণিদীপা বলেছিল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি চাও।'

স্ত্রী বসুন্ধরা। এলোমেলো চিন্তার মধ্যে যোগেন বিশ্বাসের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তার ও মণিদীপার এই পুরোনো কথোপকথনটি পুরো স্মরণ করল নিত্যগোপাল এবং ভাবল, জমির জন্যে দরখাস্ত করার কথাটা মণিদীপাকে একেবারেই না বলাটা প্রতারণা হবে। মণিদীপা সুখ চেনে, কোন রাস্তায় হাঁটলে সুবিধে হয় বুঝে ফেলে ঠিকঠাক। এ-ব্যাপারে, লক্ষ করেছে নিত্যগোপাল, ওর একটা ন্যাক্ আছে। এই চাকরিটায় জয়েন করার পর যোগেন বিশ্বাস সাপ্লায়ারদের কাছে ঘুষ নেয় শুনে বলেছিল,

তুমি নাও না কেন। পরের মাসের প্রথম রবিবারে নিত্যগোপালের বাড়িতে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন খেয়ে যায় যোগেন বিশ্বাস।

ঠিক কীভাবে এবং কখন কথাটা পাড়বে ভাবতে ভাবতে যোগেনের দেওয়া পার্কার পেনটার কথা মনে পড়ে গেল নিত্যগোপালের। রাত্রে শুতে যাবার আগে অভ্যাসমতো গা খালি করছে মণিদীপা, ওর ভারী ও নিটোল দুটি স্তনের দিকে আড়ে তাকিয়ে নিত্যগোপাল বলল, 'আজ তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি—'

'আমার জন্যে! কী?'

কলমটা এগিয়ে দিল নিত্যগোপাল।

'ওরিজিনাল পার্কার। দু' আড়াইশোর কম হবে না। যোগেন বিশ্বাস দিল তোমার জন্যে—'

'কী সুন্দর গো!' ব্লাউজের বোতাম লাগাতে গিয়েও ভুলে গেল মণিদীপা, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ওটা যোগেন বিশ্বাসের প্রাপ্য।' নিত্যগোপাল বলল, 'আজ দেখলাম হাতে একটা ডিজিটাল ঘড়ি উঠেছে। মনে হয় এক জায়গা থেকেই ম্যানেজ করেছে—'

ড্রেসিং টেবিলের ওপরে পেনটা রাখতে রাখতে মণিদীপা বলল, 'পারলে আমার জন্যেও একটা ম্যানেজ কোরো তো। এ-ঘড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে, প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়।'

'দেখি।'

আয়নায় প্রতিফলিত মণিদীপার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর শরীরে চোখ আটকে গেল নিত্যগোপালের। অক্লেশে ভাবল, এই শরীর, স্বাস্থ্যের সামনে যে-কোনো পুরুষের দম আটকে যেতে পারে। ইতিমধ্যে ছেলেপুলে হলে কি অমন খাড়া থাকত? সম্ভবত ইউট্যার্যাস ছোট থাকার রহস্য ও যন্ত্রণা আজও ভুলতে পারেনি মণিদীপা—শরীরটা তাই পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে তার দখলে। জানে না নিত্যগোপালের শিকড়ে রস নেই কোনো। যেদিন জানবে সেদিন আর প্রতিরোধ থাকবে না।

তার আগেই দেয়াল তুলতে হবে নিজের চারিদিকে।

আলো নিবিয়ে মণিদীপা বিছানায় উঠে এলে স্ত্রীর গা ঘেঁষে এলো নিত্যগোপাল। যোগেন বিশ্বাস বলেছিল স্ত্রী বসুন্ধরা, তার অজ্ঞাতে জমিজমা হয় না। হঠাৎ-পাওয়া উপহারের আহ্লাদে কাঁচা হয়ে আছে মাংস, সেই সুগন্ধের তীব্রতায় নাক ডুবিয়ে প্রত্যাশিত মুহূর্তটি খুঁজে পেল নিত্যগোপাল।

'আজ আর একটা কাণ্ড হয়েছে—'

'আবার কী হলো!'

'সল্ট লেকে সরকারী বসতজমি বিক্রি করছে। লটারি করে বিলি হবে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দিলাম।'

'আমাদের জন্যে?'

'আর কার জন্যে!'

'বলোনি তো!'

'বললাম তো, আজই করেছি। হঠাৎ খেয়াল হলো, করে দিই। লটারি তো, না ওঠার সম্ভবনাই বেশি।'

এই পর্যন্ত পৌঁছে চুপ করে গেল নিত্যগোপাল। মণিদীপাও। সম্ভবত গোড়া থেকে এ-পর্যন্ত হওয়া কথাগুলো বাজিয়ে নিচ্ছে। বলার কথাটি বলা হয়ে যাবার পর আর কোনো দায় থাকছে না। স্বপ্ন দেখলে দেখুক। ভেঙে যাওয়ার দায় সে ঠিক ততোটাই নেবে যতোটা তার নেওয়ার। এই ভেবে যথেচ্ছ হবার জন্যে তৎপর হলো নিত্যগোপাল।

বুকের ওপর এগিয়ে আসা স্বামীর হাতটা নিজের দু' মুঠোয় চেপে ধরে মণিদীপা বলল, 'যদি ওঠে!'

মণিদীপার গলা অস্পষ্ট নয়, সামান্য কেঁপে গেল এই যা।

নিত্যগোপাল বলল, 'তখনই সমস্যা দেখা দেবে। অনেক টাকার ব্যাপার—পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার। যোগেন বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললাম। অফিস থেকে লোনটোন পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম।'

'যাবে?'

'ভরসা দিল না তেমন। বললে প্রাইভেট কোম্পানী, নিয়ম-কানুন তেমন কিছু নেই। সবই বসের মর্জি!'

মুঠো আলগা করে দেবার ফলে এইবার যথাস্থানে পৌছুলো নিত্য-গোপাল এবং মণিদীপাকে রিঅ্যাক্ট করার সময় দিয়ে বলল, 'লটারিতে নাম উঠলেই অবশ্য টাকার দরকার হবে। আমার যা ভাগ্য! এতোবার টিকিট কেটেছি, কোনোবারই ওঠেনি।'

স্বামীর হাতটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে ঘন হয়ে এলো মণিদীপা, 'আমার মন বলছে উঠবে।'

'দেখা যাক।'

নিজের ছড়ানো ছিটানো অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে জড়ো করে প্রবল-ভাবে উঠে আসার চেষ্টা করল নিত্যগোপাল এবং ভাবল স্বপ্নটা পুরোপুরি গড়ে ওঠার আগেই ভেঙে দেওয়া ভালো।

অন্ধকারে এইসময় বসুন্ধরাকে প্রত্যক্ষ করে নিত্যগোপাল। স্বপ্নে আবেগ থাকে, আবেগই পাল্টে দেয় রক্তের ব্যবহার—এক লাফে উঠে যায় দশ ধাপ সিঁড়ি। নেমে যাবার আগে প্রবলভাবে উঠে এলো মণিদীপা। এমন আজকাল কালেভদ্রে ঘটে। এইসব সময়ে নিত্যগোপালের মনে হয় তার দ্বারা কথিত ডাক্তারের ব্যাখ্যাটা বিশ্বাস করেনি মণিদীপা। অবিশ্বাস প্রকাশ করতে পারে না বলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভালোবেসে নয়। আজকের ব্যাপারটা কী ভাবতে ভাবতে নিজের ঘামে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

মণিদীপা বলল, 'ঠিক করে চাইলে কনসিডার করবে না এমন তো হয় না। আমার খুড়তুতো বোন শীলারা বালীগঞ্জে ফ্ল্যাট কিনল প্রায় পুরোটাই অফিসের লোনে। ওদের অবশ্য পাবলিক সেকটর না কী বলে যেন! তোমার চাকরিও তো কম দিন হলো না!'

নিত্যগোপাল অন্ধকার খুঁজল।

'ওসব ভায়া-মিডিয়া দিয়ে যাবার দরকার কী! সরাসরি বস্‌কে ধরলেই পারো!'

'যোগেন বিশ্বাসের ওপর চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট। তার ওপর মিস্টার নন্দী। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়ে চাকরিটা যাক আর কি!'

'চাকরি অতো সহজে যায় না। তেল-তোষামোদ যোগেনবাবুকেও কম করো না। সেটা খোদ বসকেও করতে পারো। আমার বাবা বলতো বস্ ভগবান। তোয়াজে রাখলে সব খুঁটি পুঁতে দেয়—'

নিত্যগোপাল বুঝতে পারে না তার রাগটা ঠিক কার ওপর। এইসব কথা, না মণিদীপারই ওপরে। তখন অসহায় বোধ করে। আলগা লুঙ্গিটা কোমর পর্যন্ত টেনে এনে পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'দেখি—'

'তুমি আর দেখেছ!' চাপা গলায় মণিদীপা বলল, 'ছেলেপুলে হলো না। বাড়ি গাড়ি, তাও হবে না! কী জীবন!'

ঘুমের মধ্যেও কথাগুলো মনে রাখে নিত্যগোপাল। ভাবে। ভাবতে ভাবতেই ঘুরপাক খায়। কলেজে পড়ার সময় একবার সাইকেল নিয়ে লাগাতার এনডিউরেন্স ট্রায়ালে নেমেছিল। বাইশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে একই কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করার পর দেখল গোড়ায় যারা হাততালি দেবার জন্যে সমবেত হয়েছিল তাদের কেউই আর নেই আশেপাশে—চৈত্র মাসের কড়া রোদে ছাউনির বেঞ্চিতে মাথা পেতে ঘুমুচ্ছে জনা দুয়েক। সঙ্গে সঙ্গে হতাশা চেপে ধরে তাকে, খিচুনি ধরে পায়ে, ঘুরতে থাকে মাথা। হতাশাবোধ থেকে হ্যাণ্ডেলদুটো চেপে ধরতে গিয়েও গ্রীপ পায় না এবং পড়ে যায়। যারা হাততালি দিয়েছিল তারাই তখন ফালতু ভেবে দুয়ো দেয় তাকে। পায়ের ব্যথাটা তখন উঠে আসে বুকে। চেষ্টা না করলেই হতো—ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে, চেষ্টা করতে গিয়েছিল কেন! এখনও তেমনি, জমির জন্যে অ্যাপ্লিকেসন ছাড়ার পর যতো দিন যেতে লাগল ততোই মনে হতে লাগল নিত্যগোপালের, অ্যাপ্লি-কেসনটা ছেড়েছিল কেন!

একদিন সকালে খবরের কাগজ হাতে নিত্যগোপালের কাছে ছুটে এলো মণিদীপা এবং কোনো এক পাতার নির্দিষ্ট জায়গায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ক্ষুদে ক্ষুদে অঙ্কগুলির একটির ওপর আঙুল দাগিয়ে বলল,

'দেখেছ! উঠেছে!'

ঠিক এইরকম বা এরই কাছাকাছি কোনো মুহূর্তে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিল নিত্যগোপাল। আবারও পড়ল।

ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে মণিদীপা বলল, 'বলিনি তোমাকে, উঠবে?'

স্ত্রী বসুন্ধরা, তার অজ্ঞাতে জমিজমা হয় না। কথাগুলো মাথায় রেখে তার পক্ষে অস্বাভাবিক গলায় নিত্যগোপাল বলল, 'হ্যাঁ, বলেছিলে।'

খুঁটিগুলো এরই মধ্যে চিনে নিয়েছে মণিদীপা। নাম্বার থেকে আঙুল সরিয়ে নিয়ে গেল একই বিজ্ঞপ্তির তলার দিকে। বলল, 'চিঠি পেলে দেখা করতে হবে। টাকাটা জমা দিতে হবে তিন কিস্তিতে—তিন মাসের মধ্যে—'

মণিদীপার চিনিয়ে দেওয়া জায়গাগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিত্য-গোপাল বলল, 'হ্যাঁ। তাই তো লেখা আছে—'

সেদিন অফিসে যাবার সময় কাগজটার খোঁজ করলে মণিদীপা বলল, 'ওটা নিয়ে অফিসে যেতে হবে না। রসিদটার সঙ্গে তালাচাবি দিয়ে রেখেছি। প্রমাণ হাতছাড়া করতে নেই।'

নিত্যগোপাল বলল, 'যোগেন বিশ্বাসকে দেখাতাম। তা ছাড়া, কাগজ তো লাখে লাখে ছাপা হয়!'

'ওটা পয়া কাগজ, আমার কাছে থাক। দেখাতে হলে তুমি আর একটা খুঁজে নিও। তা ছাড়া দেখালেই তো ঈর্ষা করবে—'

রাস্তায় বেরিয়ে নিত্যগোপালের মনে হলো জানলা দিয়ে মণিদীপা লক্ষ্য করছে তাকে। পিছনে তাকালো এবং কাউকেই দেখতে পেল না। তখন ভাবল, তার মনে হওয়া এবং তাকানোর মধ্যবর্তী সময়টুকু মণি-দীপার সরে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সুতরাং, আরও একটু এগিয়ে, আবার চকিতে পিছনে তাকালো এবং কাউকেই দেখতে পেল না। এটা মনের ভুল হতে পারে ভেবে সে আবার পিছনে তাকাবার কথা ভাবল।

তাকালো না।

'বলেছিলাম না স্ত্রী বসুন্ধরা!' অফিসে যোগেন বিশ্বাস বলল, 'নামটা উঠেছে বউমারই লাকে।'

নিত্যগোপাল বিমর্ষ বোধ করল।

'না উঠলে বাঁচতাম।'

'মনে হচ্ছে খুশি হওনি! এইভাবে জমি পেলে—'

'ব্যাপারটা জমিতেই থাকছে না। জমির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িও চায়। অন্তত দুটো ঘর, বাথরুম, খাওয়া বসার জায়গা, বাগান—'

'খারাপ কি! ইচ্ছে না থাকলে এসব হয় না।'

'তার মানে লাখ দেড়েক। স্বপ্ন!'

'মেয়েছেলে, স্বপ্ন দেখবেই।' রসিকতার দিকে এগিয়ে গেল যোগেন বিশ্বাস, 'আমার স্ত্রী। প্রথম মেয়েটা বিয়োবার পর স্বপ্ন দেখত এবার ছেলে হবে। তারপরেও মেয়ে হলো। তখন ভাবল বার বার তিনবার। তা, তৃতীয়বারেও মেয়ে! চুলে পাক ধরেছে. দু'দিন বাদে শরীরও শুকোবে। এখনো খাঁই মেটেনি।'

বলতে বলতে ঝুঁকে এলো যোগেন বিশ্বাস।

'সে গুড়ে বালি। পার তো আমাকেই করতে হবে! কাউকে বোলো না, বছর দুয়েক হলো নিজেই অপারেশন করিয়ে নিয়েছি—'

নিত্যগোপাল আরও কিছু শোনার অপেক্ষা করল। না শুনে বলল, লোনের জন্যে একবার সরাসরি অ্যাপীল করা যায় না মিস্টার নন্দীর কাছে?'

'অ্যাপীল করলে শুনবে! এরকম দু' পাঁচটা অ্যাপীল রোজই হচ্ছে। তা ছাড়া, চেনে কতোটুকু তোমাকে?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'বরং আজই একটা অ্যাপ্লিকেসন করে দিয়ে যাও আমার কাছে। আমি চিফকে বলে রাখব।'

নিত্যগোপাল উঠে গেল। ভাবল। এবং যোগেন বিশ্বাসের

পরামর্শ মতো বিকেলের মধ্যেই দরখাস্ত লিখে ওর হাতে দিল।

'একটা মতলব মাথায় এলো। ভাবছিলাম বলব তোমাকে।' যোগেন বিশ্বাস বলল, 'এ মাসের শেষে অফিসারস্ স্পোর্টস্। নন্দী-সাহেব থাকবেন, জানোই তো? কলেজে তো স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলে শুনেছি। নামটা দিয়ে দাও—'

'পনেরো বছর আগে দম ছিল। এখন আর পারি না।'

'কে আর পারে! বুড়ো হাবড়া লোকগুলো তবু তো দৌড়য়! তুমি ইয়াং। দু' একটা প্রাইজ পেয়ে গেলে সাহেবের নজরে আসবে। আমি না হয় আলাপ করিয়ে দেবো পরে। এসব ব্যাপারে পার্সোনাল অ্যাকোয়েন্টেন্স্ অনেকটা কাজ দেয়। ভেবে দেখো।'

'দেখি—'

খুবই গম্ভীর, বিষণ্ণ ও চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরে নিত্যগোপাল দেখল মণিদীপা ব্রেসিয়ার পরেনি, পাতলা ব্লাউজের ভিতর স্থির রেখায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্তনদুটো। চলাফেরায় দুলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বলল, 'সব সময় অমন শরীর দেখিয়ে বেড়াও কেন!'

'ও মা! কী আবার দেখালাম!' বলতে বলতেই আঁচল দিয়ে বুক আড়াল করল মণিদীপা, 'তোমার টোকা অভ্যেস। এই লোডশেডিং আর গরমে নিজের বাড়ির ভেতর একটু আলগা হয়ে ঘুরবো, তাতেও তোমার আপত্তি!'

অল্প ঝাঁঝ মণিদীপার গলায়। নিত্যগোপাল কোণঠাসা বোধ করল।

'তাই বলো, লোডশেডিং। আজ এখনো অন্ধকার হয়নি কেন!'

'হবে। আজ তুমি তাড়াতাড়ি ফিরেছ।'

'তা হবে।'

মণিদীপা চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'হাত মুখ ধুলে না, বিছানায় গড়িয়ে পড়লে! ব্যাপারটা কি! গোলমাল হলো নাকি কিছু?'

'না। গোলমাল আবার কি!' কোমর ভেঙে উঠতে উঠতে নিত্যগোপাল বলল, 'জট খোলার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহলে আরও জড়ায়। যোগেন বিশ্বাস বলল লোন পেতে গেলে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে।'

'তার মানে!'

'আছে—'

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল মণিদীপা। পরের দিন ভোর পাঁচটায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনে নিকটবর্তী পার্কে গেল এবং মণিদীপার সস্নেহ প্রশ্রয়ে আণ্ডারওয়্যার ও গেঞ্জি পরিহিত নিত্যগোপাল দৌড়তে শুরু করল। প্রথম পাকটা আস্তে থেকে জোরে ঘুরে এলেও দ্বিতীয় পাকের মাঝামাঝি পৌঁছে আর এগোতে পারল না, দু' হাতে হাঁটু চেপে বসে পড়ল সে।

মণিদীপা ছুটে এসে বলল, 'কী হলো!'

মাথা ঝুঁকিয়ে তখনো হাঁফাচ্ছে নিত্যগোপাল। নিশ্বাস কখনো পড়ছে না কখনো পড়ছে, যখন পড়ছে প্রায় তখনই অতিরিক্ত হাওয়া এসে গোলমাল করছে নাকের সামনে। আকাশের দিকে মুখ তুলে কিছুটা হাওয়া গিলে নিল সে। তারপর বলল, 'জমি, বাড়ি এগুলো না হলেও আমরা বাঁচতাম।'

'ওই তোমার রোগ!' পরিশ্রান্ত নিত্যগোপালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মণিদীপা বলল. 'অ্যামবিশান বলে কিছু নেই!'

'এগুলো অ্যামবিশান নয়। লোভ।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়া-নোর চেষ্টা করল নিত্যগোপাল, 'চলো। বাড়ি চলো।'

'এরই মধ্যে! এই এক পাক ঘুরেই!'

'যদি নামি, ওই একদিনই দৌড়বো—'

'তুমি একাই দৌড়বে না, আরও অনেকেই দৌড়বে। প্রাইজ পাবে একজন বা দু'জন। তারাই নজর কাড়বে।'

টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার আগেই দুড়দাড় শব্দ হতে লাগল

নিত্যগোপালের বুকে। একটা অনুভূতি নেমে যাচ্ছে, তার পাশ দিয়েই উঠে আসছে আর একটা। অচেনা নয়। এরই নাম দ্বিধা। দৌড়বার জন্যে আর কে কে কীভাবে প্রস্তুত হচ্ছে সে জানে না, সুতরাং ফলাফলও না। দিশেহারা চোখ তুলে ও মণিদীপার মুখের দিকে তাকালো, তাকিয়েই থাকল।

মণিদীপা বলল, 'আমি দৌড়বো তোমার সঙ্গে?'

'না।'

আচমকা আবার দৌড় শুরু করে দিল নিত্যগোপাল।

পরের দিন সকালে আবার একই জায়গায় ফিরে এলো দু'জনে। তিন পাক দৌড়বার পর দু' পা ছড়িয়ে পিছনে ছুঁড়ে দেওয়া দুটি হাতে শরীরের ভর দিয়ে উর্দ্ধে মুখ তুলে নিত্যগোপাল যখন হাঁফাচ্ছে, মণিদীপা বলল, 'আজ অনেক বেশি দম পাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে সল্ট লেকের কাছাকাছি এসে পড়েছি।'

'অতো সহজ নয়, মশাই।' সময় নিয়ে মণিদীপা বলল, 'স্পোর্টসের দিন আমিও যাবো—'

নিত্যগোপাল চুপ করে থাকল।

রাত্রে মণিদীপার গায়ে গা লাগিয়ে দৌড় শুরু করবার আগে নিত্যগোপাল অনুভব করল, শরীরের আগে আগে দৌড়চ্ছে তার ভাবনাগুলো —কোনোভাবেই সাড় পাচ্ছে না শরীরে। তখন, নিজেকে নিরস্ত করার মুখে, মণিদীপা তার হাত চেপে ধরল।

'কী হলো!'

'আজ থাক!'

'আমার না হয় ইউট্যারাসের দোষ! তোমার কী?'

'অ্যামবিশানের অভাব—,' বলতে বলতে অকুতোভয়ে পাশ ফিরল নিত্যগোপাল এবং অনুভব করল, ঘুমিয়ে পড়ার আগেই তার নাক ডাকতে শুরু করেছে। নিঃশ্বাসে জড়িয়ে যাচ্ছে ঘামের গন্ধ।

পরের দিন ভোরে পার্কে যেতে যেতে মণিদীপা বলল, 'টুকিদির

ছেলে বিমান ইন্টার-স্টেট ট্রায়ালে চান্স পেয়েছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম। বলল হাণ্ড্রেড বা টু হাণ্ড্রেড মিটারস্ কিছুই নয়। দৌড়বিদের কেরামতি থাউজেণ্ড মিটারে। অনেক রাউণ্ড ছুটতে হয়।'

মণিদীপা কিছু বললে উত্তর দিতেই হয়। চুপ করে থাকার অর্থ আরও একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া। ইদানীং নিত্যগোপাল অবসাদ বোধ করে, নিতান্ত অসুবিধা না হলে প্রশ্নের আগেই যে-কোনো একটা জবাব সাজিয়ে নেয়। এখনো বলল, 'হ্যাঁ, বিমান এসব জানবে।'

মণিদীপা বলল, 'আর তো মোটে কয়েকটা দিন। তুমি একটু সিরিয়াস হও…'

স্পোর্টসের দিন প্যাভিলিয়নের নিচে নন্দীসাহেবের কাছাকাছি, ঠিক পিছনের রোয়ে যোগেন বিশ্বাসের পাশে বসে মণিদীপা দেখল দৌড় শুরু হবার আগে দশ জন প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় স্থানে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত রুমালে মুখ মুছে যাচ্ছে নিত্যগোপাল। দেখে মনে হয় একটু বেশিই সিরিয়াস, অন্যদের স্থিরতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছে নিজেকে। একটা ঢোঁক গিলে ও জিজ্ঞেস করল, 'নার্ভাস হয়ে পড়েনি তো!'

'নার্ভাস হবার কী আছে!' যোগেন বিশ্বাস বলল, 'দ্যাখোই না কী হয়!'

বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের শব্দে তখনই দৌড় শুরু হলো। বুক ও গলার মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায় নিঃশ্বাস থামিয়ে মণিদীপা দেখল, অন্যান্যদের পিছনে ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে যাচ্ছে নিত্যগোপাল। একশো মিটার পার হলো চোখের পলকে। নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিয়ে লাউডস্পীকারে নিত্যগোপালের নাম শুনতে শুনতে নন্দীসাহেবের নিকেলের ফ্রেমের চশমা-পরা ঈষৎ লম্বাটে মুখের দিকে তাকালো মণিদীপা। তাকিয়েই থাকল।

দ্বিতীয় দৌড়েও বিজয়ী হিসেবে নিত্যগোপালের নাম ঘোষিত হবার পর নন্দীসাহেব বললেন, 'সুপার্ব পারফরমেন্স। ইনি পারচেজ ডিপার্টমেন্টের না?'

এই রকমই একটি উচ্চারণের অপেক্ষায় ছিল মণিদীপা। পার্শ্ববর্তীরা কে কী বলে শোনার অপেক্ষা না করেই খোঁচা দিল যোগেন বিশ্বাসকে।

'আমার ডিপার্টমেন্টের, স্যার।' সুযোগ বুঝে মণিদীপাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল যোগেন বিশ্বাস, 'নিত্যগোপাল সামন্ত। এই যে, এই ওর স্ত্রী, মণিদীপা।'

হঠাৎ এই দুটি প্রাণীর আবির্ভাবে বিশেষ কোনো অভিব্যক্তি ফুটল না নন্দীসাহেবের মুখে। একবার মনে হলো খুশি হয়েছেন; পরের মুহূর্তেই চিড় ধরে গেল ধারণায়। এমনও হতে পারে, মণিদীপা ভাবল, নিজেদের পরিচিত করানোর এই বাড়তি উৎসাহে বিরক্তই হয়েছেন ভদ্রলোক। ভরসা এইটুকু, নন্দীসাহেবের চোখ তারই দিকে।

বড়লোকদের মনোভাব মুখে ছায়া ফেলে না। কিন্তু, এতোটা এগিয়ে এসে ফেরাও যায় না। এই ভেবে চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নিল মণিদীপা এবং আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে সযত্নে চর্চিত তার নিখুঁত বেশবাস ও শরীরের দিকে নন্দীসাহেবকে লক্ষ করার সময় দিল।

'তাই বলুন, আপনিই ইন্‌স্‌পিরেসন!' মণিদীপার ওপর থেকে চোখ তুলে যোগেন বিশ্বাসের দিকে তাকালো নন্দীসাহেব, 'যোগেনবাবু, আপনার স্ত্রী আসেননি?'

'ছোট মেয়ের জ্বর।' নিজেকে গুছিয়ে নিল যোগেন বিশ্বাস, 'তা ছাড়া এরা ইয়াং, এরাই আসবে—এরাই তো কোম্পানীর ভবিষ্যৎ—'

আর একটি ইভেন্ট শুরু হবে; মাইকে তার ঘোষণা। মণিদীপাকে চলে আসবার ইশারা করল যোগেন বিশ্বাস। মণিদীপা বুঝেছে কি না বোঝা যায় না, ভঙ্গিতে অস্বাচ্ছন্দ্য। তখন নন্দীসাহেব বললেন, 'এখানেই বসুন না—'

যোগেন বিশ্বাস দেখল চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট দৌড়ের বন্দুক ছুঁড়তে যাবার কারণ নন্দীসাহেবের পাশের চেয়ারটা খালি। পরের খালি চেয়ারটা তিনটি আসন পরে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পিছনের সারির দূরত্ব কম। বাড়াবাড়ির ভয়ে সে নিজের পুরোনো

জায়গাটিতে বসাই সাব্যস্ত করল।

'তুমি বোসো, মণিদীপা।'

থাউজেণ্ড মিটার শুরু হবে। প্রতিযোগী কমতে কমতে ছ' জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে, মণিদীপা লক্ষ করল, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় রাউণ্ডে পৌঁছুতে গিয়েই হাল ছেড়ে দিল দু'জন। নিত্যগোপাল তখনো ছুটছে এলোপাথাড়ি ভঙ্গিতে। এই দৌড়েও সে জিতবে এরকম একটা ধারণা যখন বদ্ধমূল, তখনই, চতুর্থ রাউণ্ডের শেষে, মণিদীপা দেখল, মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে নিত্যগোপাল। ওকে পড়তে দেখে আরও দু'জন দম হারিয়ে বসে পড়ল। বাকি মাত্র একজন। প্রতিযোগীহীন ট্র্যাকের ওপর সেই প্রায়-প্রৌঢ়, প্রায়-মোটা একজন নিত্যগোপালদের ছাড়িয়ে দ্রুত ধাবিত হতে শুরু করল। একটা হৈ-চৈ উঠল সমস্ত মাঠ জুড়ে, চাপা হাস্যরবও। পাশে বসে সেই হাসিতে নন্দীসাহেবও যোগ দিচ্ছেন, দেখে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল মণিদীপা। তারপর কিছু একটা বলার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই দেখল উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড় শুরু করেছে নিত্যগোপাল। গতি বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে আগের প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে দৃকপাতহীন ভঙ্গিতে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ রাউণ্ডে পৌঁছে গেল সে। তখন আর কোনো প্রতিযোগী নেই, সুতরাং হিসেব-মতো, দৌড়ও শেষ। তবুও নিত্যগোপালের রাউণ্ড পুরো করার প্রাণপণ চেষ্টা দেখে মাঠের মধ্যে আবার হাসির রব উঠল। সেই হাসি নিত্য-গোপালের কানে পৌঁছুল না। একজন ছুটে গিয়ে ধরে থামাবার পরই নিরস্ত হলো সে।

শেষ বিকেলে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার ও নিত্য-গোপালের মাঝখানে রাখা আজকের সাফল্যের প্রতীক তিনটি পুরস্কারের দিকে তাকিয়ে মণিদীপা বলল, 'দৌড় শেষ হয়ে যাবার পরও অমন বোকার মতো দৌড়চ্ছিলে কেন!'

'হয়তো বোকা বলে।' নিত্যগোপালের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়নি তখনো। আগের বাক্যটিকে দাঁড় করানোর জন্যে থেমে থেমে বলল,

'শুরুটা মনে ছিল। একবার দৌড়তে শুরু করার পর কেমন ওলটপালট হয়ে গেল সব, আমার কথাটাও গুলিয়ে গেল!'

'তোমাদের মিস্টার নন্দী যে এতো ইয়াং বলোনি তো কখনো!'

'অনেক দূরের লোক। তা ছাড়া, বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে কোম্পানীর বস্ না হলে কেউ ইয়াং থাকে না। বলার কী আছে!'

'ওর চেয়ে কম বয়সে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ।'

'হতে পারে।' নিত্যগোপাল হাসবার চেষ্টা করল, 'এই রোদে মুখে রক্ত উঠিয়ে সকলে দৌড়য় না।'

মণিদীপা চুপ করে গেল। ট্যাক্সিটা আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর বলল, 'আমি কিন্তু ওঁকে একদিন বাড়িতে আসতে বলেছি—'

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে একদিন নন্দীসাহেবের ঘরে নিত্য-গোপালের ডাক পড়ল। ইন্টারভিউয়ের সময় একবার ঢুকেছিল—চাকরিতে জয়েন করার পর এই প্রথম। অভাবিত এই ঘটনায় রীতিমতো বিমূঢ় বোধ করল নিত্যগোপাল। তখন শুনল এবং অনুমানও করল, আগামীতে সম্পূর্ণ দুটি ঘটনায় তার জীবন অনেকটা বদলে যেতে পারে। এক, জমি কেনার পুরো টাকাটাই তার পক্ষে সহজে পরিশোধ্য কিস্তিতে লোন দেবে কোম্পানী। দুই, সামনের মাস থেকে পারচেজ অফিসারের পদে প্রোমোশন পাবে নিত্যগোপাল।

'আর কিছু বলল?'

'না। ব্র্যাঞ্চ অফিসগুলোতে মাঝে মাঝে ট্যুরে যেতে হবে— ওখানে নাকি চুরিচামারি হয়—'

'এখানে হয় না!'

অনুভূতিগুলো ক্রমশ ভোঁতা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো কিছু-কিছু কথার মানে খুঁজে পায় নিত্যগোপাল। যোগেন বিশ্বাসের কথার শ্লেষ-টুকু ধরতে পেরে বলল, 'আপনিও তো সিনিয়র হয়েছেন?'

'তা হয়েছি। একসঙ্গে দুটো পারচেজ অফিসার রাখার দরকার কী! সিনিয়র না করলে চাকরি যেত—'

বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল নিত্যগোপাল।

'এক ঢিলে দুই পাখি! বউমাকে জানিয়েছ?'

শেষ দৌড়ের মাঝামাঝি জায়গা। এই সময়েই মুখ থুবড়ে পড়ে যায় নিত্যগোপাল এবং গভীর হতাশার মধ্যে লক্ষ করে, প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে পিছন থেকে উঠে আসছে একজন। হেরে যাবার ভয়ে তখনই সে উঠে দাঁড়ায়। দৌড় একবার শুরু করলে দৌড়তেই হয়।

'এই জানলাম। বাড়িতে তো টেলিফোন নেই যে সঙ্গে সঙ্গে জানাবো!'

'টেলিফোনও পাবে। এখন এনটাইটেল্‌ড্‌ হলে। সবই হবে আস্তে আস্তে। তবে—'

এই প্রথম গালে টোল না ফেলেও হাসল যোগেন বিশ্বাস, 'নিজের জায়গা থেকে সরে যাচ্ছ, ম্যানেজ করতে পারবে তো!'

বলতে বলতে ঝুঁকে এলো। কথাগুলোর কী অর্থ হতে পারে ঠিক ঠিক বোধগম্য না হওয়ায় গুলিয়ে ফেলল নিত্যগোপাল। শুনল, আর কোনো ঝামেলায় জড়ানোর ভয়ে গোপনে অপারেশন করিয়ে নিয়েছে যোগেন বিশ্বাস। ডাক্তার বলেছিল নিয়মিত ওষুধ খেলে সেরেও যেতে পারে। যদি না সারে! এই ভয়ে সে মণিদীপার ইউট্যার‍্যাস ছোট করে দিয়েছিল।

ঘোরটা চলে। বিকেলের মধ্যেই প্রায় ডায়াবিটিক হয়ে ওঠে নিত্যগোপাল। টিফিনে অরুচি; তলপেট ঝুলে পড়ায় বাথরুমে গেল কয়েকবার। শেষে নন্দীসাহেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নিয়ে বলল, 'এতোটা লোন আমার দরকার নেই, স্যার। আমার নিজেরও কিছু টাকা ছিল, তা ছাড়া—'

'আটকাচ্ছে কোথায়!'

'এতো টাকা শোধ দেওয়া—'

'শোধের কথা এখনই উঠছে কেন! আপনি যে-টার্ম্‌স্‌-এ চেয়েছিলেন, তাই দেওয়া হয়েছে। কিছুই ফোর্স করা হয়নি। তা ছাড়া,

প্রোমোশনের ফলে আপনার স্যালারিও তো অনেক বেড়ে যাবে।'

তার ও নন্দীসাহেবের মাঝখানে একটা মাছি অনেকক্ষণ ধরে ওড়াউড়ি করছিল। উপলক্ষ সে হলেও নন্দীসাহেবের চোখ ছিল মাছি-টারই ওপরে। এখন হাতে-ধরা পাকানো কাগজের একটি আঘাতে সেটিকে হত্যা করে মৃত মাছিটিকে টেবিলের ওপর থেকে সরাতে সরাতে বললেন, 'আর কিছু বলবেন ?'

নিকেল-ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে সরাতে নিত্যগোপাল লক্ষ করল লোকটির মুখের দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় দ্বিগুণ ; চশমা না থাকায় আরও লম্বাটে দেখাচ্ছে। এই ধরনের মুখে অভিব্যক্তি ফোটে না। সে চুপ করে থাকল।

'সামনের উইক থেকে আপনার ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরি করা হচ্ছে। মন দিয়ে কাজ করুন, সো ছাট ইউ ক্যান কাম আপ—'

নিত্যগোপাল চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে দাঁড়াল।

'আপনার বাড়িতে টেলিফোন ইনস্টল করতে বলেছি। দিন দশেকের মধ্যেই হওয়ার কথা। হোক বা না হোক আপনার স্ত্রীকে বলবেন আমাকে একবার ফোন করে জানাতে—'

নিত্যগোপাল চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে দাঁড়াল।

'ট্যুরে থাকলে বাড়িতে ট্রাঙ্ককল করে খোঁজ খবর করতে পারবেন। কোনো প্রব্লেম হলে অফিসে জানাবেন—'

বাড়ি ফিরে চিঠিদুটো মণিদীপাকে দেখাল নিত্যগোপাল। পড়বার সময় দিয়ে বলল, 'কোম্পানীতে দুটো পারচেজ অফিসারের দরকার নেই। মনে হচ্ছে যোগেনদার চাকরিটা এবার যাবে—'

মণিদীপা জবাব দিল না। উত্তেজিত মুখ ; একবার পড়বার পর আরও একবার পড়বার জন্যে হাতবদল করল চিঠিদুটো।

'বাড়ির লোনও নিশ্চয়ই দেবে ?'

'দেওয়া তো উচিত।'

'তাহলে বড়ো করেই প্ল্যান করা ভালো।'

'দ্যাখো—'

মণিদীপা এবার চোখ তুলে তাকালো।

'বিশ্বাস হচ্ছে না। হঠাৎ এইসব—সবই যেন বদলে গেল—! আজ মঙ্গলবার, চলো কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসি। ভগবান না দিলে এতো হয় না!'

'ভগবান পালিয়ে যাচ্ছে না।' অন্যমনস্ক গলায় নিত্যগোপাল বলল, 'তাড়ার কী আছে!'

'এমন ডিপ্রেস্‌ড্‌ গলা কেন তোমার! মনে হচ্ছে খুশি হওনি!'

নিত্যগোপাল হাসল এবং বলল, 'খুশি না হবার কী আছে!'

তিনমাস পরে একদিন অনেক রাতে ট্যুর থেকে বাড়ি ফিরে নিত্য-গোপাল দেখল মণিদীপা ব্রেসিয়ার পরেনি, পাতলা ব্লাউজের নিচে থেকে স্পষ্ট রেখায় দেখা যাচ্ছে তার ভারী ও ঈষৎ ঢলনামা নিটোল স্তনদুটো। কিছু বলবে কি না ভেবে নিয়ে সে বলল, 'সব সময় অমন শরীর দেখিয়ে বেড়াও কেন!'

'ওমা, দেখানোর কী আছে! যা গরম!'

আঁচল সরানোর জন্যে আজ আর তেমন কোনো তৎপরতা দেখা গেল না মণিদীপার। নিত্যগোপালের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে বলল, 'যোগেনবাবুকে ফোন করে জানলাম আজ ফিরছো। একটা ট্রাঙ্ককল করে জানতেও তো পারো কেমন আছি না আছি—'

নিত্যগোপাল বলল, 'খারাপ থাকবে কেন!'

তারপর আরও রাত হলো এবং ওরা বিছানায় গেল। আলো নিবিয়ে মণিদীপা তার গা ঘেঁষে এলে অবসাদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ তাপ বোধ করল নিত্যগোপাল। টের পেল, ভাগ্য পরিবর্তন হলেও মণিদীপার শরীর থেকে এখনো একইরকম গন্ধ বের হয়। তখন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেশানো একরকম তৎপরতা থেকে হাতটা মণিদীপার বুকের ওপর নিয়ে যেতে সবেগে উঠে এলো মণিদীপা। স্বামীর হাতটা বুকের ওপর চেপে ধরে বলল, 'ডাক্তার বলেছিল না অনেক মেয়ের দেরিতেও হয়?'

'কেন!'

'গত মাসে হয়নি। এবারেও দিন চলে গেল!' মণিদীপা বলল, 'একদিন নিয়ে চলো না ডাক্তারের কাছে?'

আঙুল জুড়ে অবসাদ। নিত্যগোপাল অনুভব করল গ্রীপ পাচ্ছে না। হাতটা টেনে নেবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছু ভেবে নিরস্ত করল নিজেকে। তারপর যে-গলায় ইউট্যারাস ছোট হওয়ার কথা বলেছিল, সেই গলাতেই বলল, 'যাবার কী আছে! বলেছিল—হতেই তো পারে—'

'যদি হয়!'

নিত্যগোপাল জবাব দিল না। মণিদীপার পাশ ফেরার সুযোগে ওর বুক থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়েও সরালো না পুরোপুরি। দ্বিতীয় চেষ্টায় কোমরের ওপর রাখল।

'তুমি কি চাও? ছেলে, না মেয়ে?'

অন্ধকারে মণিদীপার নিঃশ্বাস পড়ছে মুখের ওপর। ভাববার জন্যে ঠিক কতোটা সময় দরকার মনে মনে পরিকল্পনা করে নিল নিত্যগোপাল। এটা তার পুরোনো স্বভাব। অন্ধকারে যতোটুকু হাসা যায়, ঠিক ততো-টুকুই হাসল। হাসতে হাসতেই পাশ ফিরল এবং বলল, 'ছেলেই তো ভালো—'

সমাপ্ত